অক্টোবর ২০১৬ ▪ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩

# সচিত্র বাংলাদেশ

## বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের নতুন দিগন্ত

## বাংলাদেশের দারিদ্র্য জয় ও উন্নয়ন বিস্ময়

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ হক

# সচিত্র বাংলাদেশ

## পড়ুন ও লেখা পাঠান

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠাতে হবে
email : dfpsb@yahoo.com

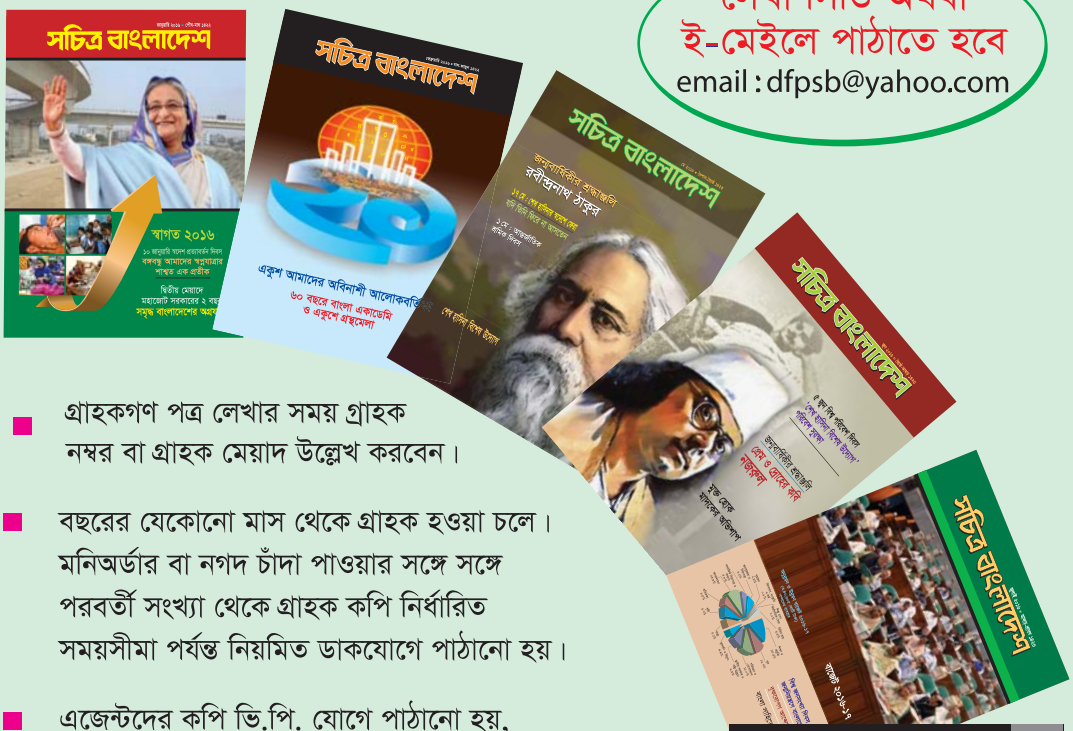


- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
- বছরের যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

**সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা**
**ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা**
**প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।**

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

# সচিত্র বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৬ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে ভাষণ দেন – পিআইডি*

# সম্পাদকীয়

বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বাস্তবমুখী নেতৃত্বের সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে। এ সফর বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

জাতিসংঘের ৭১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণটি নানা কারণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্ধারিত ভাষণে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতিসহ বিশ্বের সমকালীন নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাদেরকে এসব বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। জাতিসংঘের ৭১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ওপর রয়েছে একটি বিশেষ নিবন্ধ।

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ এক অনুকরণীয় নাম। সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগ আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে দারিদ্র্য জয় করতে সক্ষম হয়েছে। ১৭ অক্টোবর ছিল বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার সাফল্যের রহস্য তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, '২০২১ সাল নাগাদ আমরা দারিদ্র্যের হার ৭ শতাংশ বা ৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে চাই'। এবারের সংখ্যায় এ নিয়ে থাকছে বিশেষ প্রতিবেদন ও নিবন্ধ।

অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে এবং বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির আলোকে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সকল শিশুর সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হয়। একই দিনে জাতির পিতার সাথে শিশু রাসেলকেও হত্যা করে ঘাতকেরা। শিশু রাসেলের জন্মদিন নিয়ে রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ ও গল্প।

তথ্য জানার অধিকার জনগণের একটি মৌলিক অধিকার। তথ্য অধিকার আইন সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এ নিয়ে রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ। এছাড়াও রয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ। এবারের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল– একটি সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

আরো রয়েছে পার্বত্য শান্তিচুক্তির ১৯ বছর– 'পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস, জীবনের জয়গান' বিষয়ক একটি নিবন্ধ। একই সঙ্গে রয়েছে নিয়মিত বিভাগ।

আশাকরি সংখ্যাটি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করবে।।


**প্রধান সম্পাদক**
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান

**সিনিয়র সম্পাদক**
শিবপদ মণ্ডল

**সম্পাদক**
সুফিয়া বেগম

**শিল্প নির্দেশক**
মোস্তফা কামাল ভূইয়া

**সহকারী শিল্প নির্দেশক**
গনেশ চন্দ্র দেবনাথ

**সিনিয়র সহ-সম্পাদক**
সুলতানা বেগম

**কপি রাইটার**
মিতা খান

**সহ-সম্পাদক**
সাবিনা ইয়াসমিন

**সম্পাদনা সহযোগী**
শারমিন সুলতানা শান্তা
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

**অলংকরণ**
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
সুবর্ণা শীল
নাহরীন সুলতানা

**আলোকচিত্রী**
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
ফোন : ৯৩৩৩১২০, ৯৩৩৩১৪৯ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

**বিক্রয় ও বিতরণ**
**সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

**মূল্য : পঁচিশ টাকা**


# সূচিপত্র


**সম্পাদকীয়**
**সূচিপত্র**

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর ঢাকা সফর
বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কে নতুন দিগন্ত ৪
বীরেন মুখার্জী

জাতিসংঘের ৭১তম অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী
আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো
টলারেন্স' নীতিতে বিশ্বাসী ৭
রোকেয়া আক্তার

বাংলাদেশের দারিদ্র্য জয় ও উন্নয়ন বিস্ময় ১০
সৈয়দ শাহরিয়ার

তথ্যই শক্তি, তথ্যই প্রগতি ১২
সুফিয়া বেগম

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ১৯ বছর
পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস, জীবনের জয়গান ১৪
মাহবুব রেজা

বিশ্ব শিশু দিবস
শিশু অধিকার ও শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮
খালেক বিন জয়েনউদদীন

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ হক ২০
সাইয়েদা ফাতিমা

খাদ্য নিরাপত্তায় বিশ্বে মডেল বাংলাদেশ ২২
ইলিয়াছ হোসেন পাভেল

**গল্প**

জন্মদিনের ছবি ২৫-২৭
রফিকুর রশীদ

**কবিতাগুচ্ছ** ২৮-৩০

হাসান হাফিজ, শাহরিয়ার নূরী, রফিক হাসান, কনক চৌধুরী, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, মো. মিজানুর রহমান মুন্সী, মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান, মিলি হক, আরেফিন রব, মো. নুরুল ইসলাম

**ধারাবাহিক উপন্যাস**

ভ্রষ্ট বিলাস ৩১-৩৩
সাগরিকা নাসরিন

কেমন আছেন আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠী ৩৪
মিনার মনসুর

বাংলাদেশের দুর্যোগ পরিস্থিতি ও সচেতনতা ৩৭
শামস সাইদ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি : সতর্ক হওয়ার এখনই সময় ৪০
নাজনীন সুলতানা নীতি

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৪২
বাকী বিল্লাহ

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশ বর্তমান সরকারের কৃষি খাতে সাফল্য ৪৫
মিজানুর রহমান মিখুন

## বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৭
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৫০
আমাদের স্বাধীনতা ৫০
জাতীয় ঘটনা ৫১
উন্নয়ন ৫৩
নারী ৫৩
শিক্ষা ৫৫
প্রতিবন্ধী ৫৫
জেন্ডার ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৭
সংস্কৃতি ৫৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৮
কৃষি ৫৯
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬০
যোগাযোগ ৬১
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৬১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬২
চলচ্চিত্র ৬৩
আন্তর্জাতিক ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

## বাংলাদেশের দারিদ্র্য জয় ও উন্নয়ন বিস্ময়

দারিদ্র্য বিমোচন বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ এক অনুকরণীয় নাম। এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলল বহুজাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক থেকে। সংস্থাটি বলছে, সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগ আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশে হতদরিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। দেখুন, পৃষ্ঠা-৭

## বাংলাদেশের দুর্যোগ পরিস্থিতি ও সচেতনতা

যে-কোনো দুর্যোগই মানব জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। যা-হোক প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। নানা নামে পরিচিত ভয়ংকর সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানে। বিপন্ন করে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব না। দেখুন, পৃষ্ঠা-৩৫

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb@yahoo.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

## শিশু অধিকার ও শেখ রাসেলের জন্মদিন

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ নীতিমালা ও ঘোষণা অনুযায়ী শ্রম অধিকার স্বীকৃতিতে শিশু অধিকার সনদ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত হয়। এই সনদের মূল কথা হলো

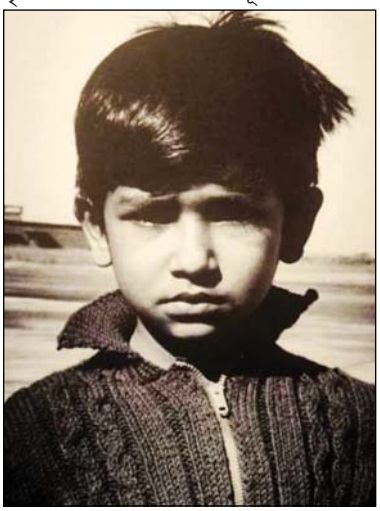

মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তথা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য হচ্ছে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা প্রদান করা। দেখুন, পৃষ্ঠা-১৫

### চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর ঢাকা সফর

# বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কে নতুন দিগন্ত

**বীরেন মুখার্জী**

বর্তমান বিশ্বে দ্বিতীয় প্রধান অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন। আর বাংলাদেশ-চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চার দশক অতিক্রম করেছে। প্রাথমিক অবস্থায় চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ধরনটা ছিল কূটনৈতিক ও সামরিক বিষয়কেন্দ্রিক। পরবর্তীতে এই সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়েছে। সম্পর্ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে উভয় দেশের অর্থনীতি-বাণিজ্যসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়াদি। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের মধ্যদিয়ে উভয় দেশের এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে অর্থনীতি থেকে রাজনৈতিক সহযোগিতায়ও উত্তরণ ঘটেছে। ১৯৮৬ সালের পর উচ্চ পর্যায়ের কোনো চীনা নেতা এবারই প্রথম বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪১তম বার্ষিকীও উদ্‌যাপিত হয়েছে সম্প্রতি। সংগত কারণে চীনা প্রেসিডেন্টের এই সফর বাংলাদেশের জন্য যেমন গৌরবের, তেমনি দেশের সমৃদ্ধির স্বার্থেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ শতকের আশির দশকে চীনে আধুনিকায়ন শুরু হলে দেশটি অনেকটাই এগিয়ে যায়। পরবর্তীতে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পরে বিশ্ববাজার অর্থনীতির দাপট শুরু হয়। বলতে গেলে, বিশ্বায়নের নামে বাজার অর্থনীতি সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটলে এর সবচেয়ে বড়ো সুফলভোগী হয় চীন। ফলে চীনের প্রভূত উন্নয়ন ঘটে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়তে থাকে দেশটির এবং চলতি শতকের শূন্য দশকের শুরু থেকে চীন দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। বলা যায়, ২০০৬-০৭ সালের দিকে চীন বিশ্বে অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ক্রয়ক্ষমতা সাম্যের (পিপিপি) দিক থেকে এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি চীন। বলা বাহুল্য, চীন আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ সুসম্পর্ক তৈরি করেছে। এ সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো অর্থনীতি। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ চীনের সাহায্য, ঋণ কিংবা অর্থায়নে অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি করেছে। সেখানে সমুদ্রবন্দর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেতু ও বড়ো ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র সবই চীনের সাহায্যে করা হয়েছে। প্রায় অর্ধ যুগ ধরে পশ্চিমা দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় থাকায় বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো চাহিদা মেটানোর সামর্থ্য তাদের নেই। আর এ সুযোগটি নিয়েছে চীন। এতে চীন যেমন নিজে শক্তিশালী হয়েছে, তেমনি অন্য রাষ্ট্রকেও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে সহায়তা করেছে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করবে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক এবং বৈঠক শেষে ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে এই বিষয়টিই প্রতীয়মান হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর এই সফরের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেল। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ভূমিকার কারণে। তাই এ সাফল্য যেমন বাংলাদেশের মানুষের তেমনি বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারেরও।

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ঘিরে শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয়, বরং বলা যেতে পারে বিশ্ববাসীরও দৃষ্টি ছিল। কেননা, চীন যেমন বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি, তেমন বাংলাদেশও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

*রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৪ অক্টোবর ২০১৬ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গণচীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংকে স্বাগত জানান –পিআইডি*

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ সফররত গণচীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর নেতৃত্বে ১৪ অক্টোবর ২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় –পিআইডি*

এমন একটি সময়ে চীনের প্রেসিডেন্টের এই সফর নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলাই বাহুল্য, চীনের তৈরি পণ্য শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গেই চীনের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। জনবহুল একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও চীন কীভাবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠল, বর্তমান বিশ্বে তা যেমন আলোচনার বিষয়, তেমনি বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কও স্মরণ করার মতো। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠী রয়েছে, এই জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে চীনের কাছ থেকে শেখার রয়েছে অনেক কিছু। তাই এটা বলা বোধ করি অত্যুক্তি হয় না যে, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনকে পাশে পাওয়ার অর্থই হলো বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। যার রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তনয়া আমাদের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

চীনা প্রেসিডেন্টের এই সফরের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। 'ওয়ান-বেল্ট, ওয়ান রোড' নীতি ধরে এগিয়ে যাওয়া চীনের সহযোগিতা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবেই সেদেশের প্রেসিডেন্টের এই সফর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে চীনা প্রেসিডেন্ট জানান, চীন বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের 'গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার' বলে মনে করে। আর এ কারণেই চীন বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক রাজনৈতিক আস্থার সম্পর্ককে আরো মজবুত করতে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। দুই দেশের সহযোগিতার সম্পর্ককে আমরা আরো উঁচুতে নিয়ে যেতে চাই– চীনা প্রেসিডেন্টের এমন বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিফলিত হয়েছে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে। বাংলাদেশ যখন নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিল্পায়ন আর বিনিয়োগের জন্য মুখিয়ে আছে; এমনই এক সময়ে চীনের সহযোগিতা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখবে।

এটা স্বীকার করতে দোষ নেই যে, আমরা একটি দুর্বল অবকাঠামোর দেশ। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিনিয়োগ। দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে অবকাঠামো ও শিল্পায়নের জন্য আগামী ১০ বছরে বিভিন্ন খাতে আমাদের প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। আর সার্বিক পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, প্রথাগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ততার পাশাপাশি অবকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশে চীনের উপস্থিতি আগের তুলনায় বেড়েছে। আবার চীন সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে, যেটি কয়েক দশক ধরে ভারতের দখলে ছিল। তবে এবার চীনের প্রেসিডেন্টের সফরের মধ্যদিয়ে শুধু অর্থনৈতিক বিষয়াদিই নয়, সন্ত্রাসবাদ দমন, বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভের (অঞ্চল ও পথের উদ্যোগ) মতো সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রেও যুক্ত হলো বাংলাদেশ-চীন। ফলে এটা বলার যথেষ্ট দৃঢ়তা রয়েছে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বিরাজমান ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক চীনা প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরের মধ্যদিয়ে আরো বেগবান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ায় তা এক 'নতুন দিগন্তের উন্মোচন' করেছে।

এটা লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনায় আমরা অর্থনীতির একটা পর্যায়ে এসেছি। দীর্ঘদিন ধরে একটা স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করে আসছে আমাদের প্রিয় দেশ। তবে এ প্রবৃদ্ধির বণ্টন নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সামষ্টিক অর্থনীতিতে এর সুফল নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। আলোচ্য প্রবৃদ্ধির ফলে আমাদের অর্থনীতির চাকাও সচল আছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে এখন প্রায় দেড় হাজার ডলার হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে দেশের ভেতরে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে অবকাঠামো উন্নয়নের, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভোগের। পুঁজিবাদী বা বাজার অর্থনীতিতে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং আলোচ্য অর্থনীতিতে এটি একটি চক্র। এ চক্রে জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমাদের ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দরকার। আবার অবকাঠামো চাহিদা মেটানোও প্রয়োজন। উভয় দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে, চীনই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বেশি সুযোগ প্রদান করতে পারে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন চাহিদা পূরণের সক্ষমতা। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় চীন–অর্থনীতি বিশ্লেষকদের এ মন্তব্য অস্বীকার করা যাবে না। কেননা, চীনের অর্থ নিয়ে শুধু

বাংলাদেশের নয়, আফ্রিকার দেশগুলোরও ব্যাপক উন্নয়নের বিষয়টি আগেই তুলে ধরা হয়েছে। চীনের প্রতি বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রেরই এক ধরনের আকর্ষণ আছে। বাংলাদেশের থাকাটাও স্বাভাবিক। যেহেতু বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের পরীক্ষিত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিদ্যমান।

বিনিয়োগ অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রশ্ন হতে পারে, চীনের সঙ্গে সাহায্য-বাণিজ্য-বিনিয়োগের মাধ্যমে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো, তা আমরা কীভাবে কাজে লাগাবো? সেখানে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো কী, সেদিকে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো, মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তির কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার জন্য অনেক দেশই মুখিয়ে আছে। ফলে আমরা সুযোগগুলো কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে অন্য দেশ তা লুফে নেবে। কাজেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া এবং সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা উচিত। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধক হিসেবে দুর্নীতি এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কথা বলে। ফলে স্পষ্ট যে, দুর্নীতি নির্মূল করতে না পারলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অধরাই থেকে যাবে। এজন্য দুর্নীতি দমনে সরকারের সদিচ্ছা অত্যন্ত জরুরি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চীনের যে অংশগ্রহণ, তাতে একটি সংশয়ও দুল্যমান। চীনের সঙ্গে নবতর এই সম্পর্কের কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের শক্তিশালী অংশীদার, উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর অনেকেই হয়ত বিষয়টিকে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব থেকে দেখতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের এক ধরনের সংশয়, এক ধরনের বঞ্চনাও কাজ করতে পারে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে তারা যুক্ত হতে পারছে না; অন্য রাষ্ট্র যুক্ত হচ্ছে। এটা অনেকটা কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বা সমাধানের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার বা রাষ্ট্রের। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশ কোনো রাষ্ট্রের জন্য হুমকি নয়। আমরা সবসময় একটি শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র। আমাদের প্রত্যাশা একটি শান্তিপ্রিয় বিশ্ব। এছাড়া এখন বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধের মতো কোনো পরিস্থিতিও নেই। কাজেই বাংলাদেশে যদি চীন ব্যাপকভাবে উন্নয়নে সহায়তা করে, সেটি অন্য কোনো রাষ্ট্র বা উন্নয়ন অংশীদারের জন্য মাথাব্যথার কিংবা ভীতির কারণ হতে পারে না। এরপরও সরকারের কর্তব্য হওয়া দরকার কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি সরকার বজায় রেখেছে, তা অব্যাহত রাখতে হবে।

চীন আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু এ কথা স্বীকার করেই বলা যেতে পারে, দেশটি বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ হাজার পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এরপরও আমরা চাই, তৈরি পোশাকসহ সব পণ্যই চীনে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে 'জিরো ট্যারিফ' ধার্য হোক। তা না হলে চীনের সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা সহজে দূর করা যাবে না। বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সময় ও সংকটের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। বিদ্যমান এ বাস্তবতায় জোর কূটনৈতিক তৎপরতায় এ প্রত্যাশারও বাস্তবায়ন ঘটা অসম্ভব নয়। আমরা এখন গড়ে ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি। এ হার ৮ বা ২ অঙ্কে নিয়ে যেতে চাইলে চীনের মতো সক্ষম রাষ্ট্রই আমাদের বেশি প্রয়োজন। আর সরকার এ বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক।

পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই, চীনের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গভীর হলেও, বাংলাদেশকে সহায়তাকারী প্রতিটি দেশের সঙ্গেও সম্পর্কের পৃথক পৃথক প্রেক্ষাপট রয়েছে। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য। বাংলাদেশ এনপিটি, সিটিবিটি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। নারী অধিকার সম্পর্কিত যেসব আন্তর্জাতিক সনদ আছে, তাতে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। এছাড়া এন্টি-মানি লন্ডারিংসহ অপরাধ দমনমূলক যে বিশ্ব প্রক্রিয়া, সেসবের সঙ্গেও বাংলাদেশ যুক্ত। ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে, দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে বা বিশ্ব পর্যায়ে কোনো রাষ্ট্রের বিপক্ষে যাওয়ার নীতি বাংলাদেশের নেই। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দিকে তাকালেও তা স্পষ্ট। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এই বাস্তবতা সরকারের সুদূরপ্রসারী ইতিবাচকতাকেই নির্দেশ করে। তবে বাংলাদেশকে এটা বিবেচনায় রেখেই অগ্রসর হতে হবে যে, আমাদের দেশটি যখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে, তখন এদেশের সাত থেকে আট কোটি মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটবে। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশ্বের যে-কোনো বহুজাতিক কোম্পানির লাভজনক ব্যবসার অন্যতম বড়ো ক্ষেত্র। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্র, যাদের সঙ্গে আমরা এখন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা ভাবছি, তারা সবাই তাদের নিজেদের সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি দেখছে। তারা দেখছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে। আর এসব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় চীনের মতো সক্ষম রাষ্ট্রকে বাংলাদেশ যে সর্বতোভাবেই স্বাগত জানিয়েছে, এই সফরে সেটাই স্পষ্ট। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে চীনের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার বাংলাদেশ। ফলে বিরাজমান এই সুসম্পর্কের মধ্যদিয়ে চীনা প্রেসিডেন্টের সফর এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কসহ নানা ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে নতুন ভিত্তি সূচিত হলো তা যাতে দৃঢ় ভিত্তি পায় সেদিকেই সরকারের গভীর মনোযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। চীনের মতো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী একটি দেশ যেহেতু বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে, সেহেতু আমাদের প্রত্যাশার ক্ষেত্রও প্রসারিত হওয়া অযৌক্তিক নয়। অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনের সহযোগিতা নিয়ে অচিরেই আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব–এমন আশাবাদ আমরা করতেই পারি।

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশ সফররত গণচীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সাথে বৈঠক করেন –পিআইডি*

*লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গণমাধ্যম কর্মী*

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে ভাষণ দেন – পিআইডি*

**জাতিসংঘের ৭১ তম অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী**

# আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে বিশ্বাসী

**রোকেয়া আক্তার**

এবারের জাতিসংঘের ৭১ তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণটি নানাকারনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার জাতিসংঘের অধিবেশনে তাঁর নির্ধারিত ভাষণে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতিসহ বিশ্বের সমকালীন নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিশ্ব নেতৃ বৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ একই সঙ্গে তাদেরকে এসব বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। শুধু তাই নয় নারীদের জন্য টেকসই ভবিষ্যত নির্মাণের লক্ষ্যে সুযোগ সম্প্রসারণ এবং কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত রাখতে বিশ্বনেতাদের প্রতিও শেখ হাসিনা আহবান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখা হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ্যায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১ তম অধিবেশনের ভাষণে বলেন, উত্তেজনা এবং ভীতিকর পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব মুক্ত নয়। বেশ কিছু স্থানে সহিংস-সংঘাতের উন্মত্ততা অব্যাহত রয়েছে। অকারণে অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। যারা সংঘাত থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন, প্রায়শই বিভিন্ন দেশ তাঁদের নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করছে। কখনও কখনও অত্যন্ত জরুরী মানবিক চাহিদা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে অথবা সেগুলো প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ভাষণে বলেন, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে এই মহান সাধারণ পরিষদে বলেছিলেন, শান্তির প্রতি যে আমাদের পূর্ণ আনুগত্য, তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবো।

বিশ্ব বর্তমানে এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যখন এ সকল অভিশাপ থেকে মুক্তি খুব একটা দূরে নয়। অনেক সৃজনশীল এবং প্রায়োগিক সমাধান এখন নাগালের মধ্যে। প্রযুক্তি, নব্য চিন্তাধারা এবং বৈশ্বিক নাগরিকদের বিস্ময়কর ক্ষমতা আমাদের একটি ‘নতুন সাহসী বিশ্ব’ সম্পর্কে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, কী অপরাধ ছিল সাগরে ডুবে যাওয়া সিরিয়ার ৩-বছর বয়সী নিষ্পাপ শিশু আইলান কুর্দীর? কী দোষ করেছিল ৫-বছরের শিশু ওমরান, যে আলেপ্পো শহরে নিজ বাড়িতে বসে বিমান হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে? একজন মা হিসেবে আমার পক্ষে এ সকল নিষ্ঠুরতা সহ্য করা কঠিন। বিশ্ব বিবেককে কি এসব ঘটনা নাড়া দিবে না?

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে অভিবাসী ও শরণার্থী বিষয়ক একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনের ফলাফল বর্তমান সময়ে অভিবাসনের ধারণা এবং বাস্তবতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করবে। অভিবাসী ও শরণার্থীদের স্বদেশ এবং গন্তব্য উভয় স্থানের জন্যই সম্ভাবনাময় পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশ নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত অভিবাসন সংক্রান্ত রূপরেখা প্রণয়নে সহযোগিতা করতে আগ্রহী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং শোষণমুক্ত স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ‘ভিশন-২০২১’ এবং ‘ভিশন-২০৪১’ বাস্তবায়ন করছি, তার সঙ্গে এগুলোর সমন্বয় করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, শক্তিশালী, ডিজিটাল এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য আমাদের সরকার উদ্ভাবনমূলক সরকারি সেবা বিতরণ, জনসাধারণের তথ্য লাভের অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ও সেবা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, কৌশলগত অবস্থান বাংলাদেশকে আঞ্চলিক সংযোগ, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক আউটসোর্সিং-এর ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছে। উন্নয়ন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে বেশ কিছু বৃহদাকার অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল (বিবিআইএন)-এর মধ্যে বাণিজ্য এবং নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ

করা হচ্ছে। একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের আলোচনা চলছে। তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজধানী ঢাকা শহরে মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজও শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরি করে দিতে দেশব্যাপী একশ'টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও বিগত সাত বছরে আমাদের রপ্তানি আয় প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩.৫ বিলিয়ন থেকে সাড়ে আট গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের অনেকগুলো উন্নয়ন অর্জনকে হুমকির মুখোমুখি করছে। ঐতিহাসিক প্যারিস জলবায়ু চুক্তিটি অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি এবং জলবায়ু সম্পর্কিত ন্যায় বিচারের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এই জলবায়ু চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। বৃহৎ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলি অতি সত্বর চুক্তিটিতে অনুসমর্থন জানাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা, স্পিকার এবং সংসদ উপনেতা সকলেই নারী। চলমান জাতীয় সংসদে আমাদের ৭০ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন, যা সংসদের মোট আসনের ২০ শতাংশ। ১২ হাজার ৫শ'র বেশী নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কাজ করছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিশেষভাবে জোর দেন বিশ্বব্যপি চলতে থাকা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমান সময়ের দুটি প্রধান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা। এই চ্যালেঞ্জগুলো এখন কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিশ্বের সকল স্থানেই ছড়িয়ে পড়ছে। কোন দেশই আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ নয়, কোন ব্যক্তিই এদের লক্ষ্যবস্তুর বাইরে নয়। আমেরিকা থেকে ইউরোপ, আফ্রিকা থেকে এশিয়ায় অগণিত নিরীহ মানুষ সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র নেই। এদেরকে সর্বোতভাবে সমূলে উৎপাটন করার সংকল্পে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সন্ত্রাস ও সহিংস জঙ্গিবাদের মূল কারণগুলো আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। একইসঙ্গে এদের পরামর্শদাতা, মূল পরিকল্পনাকারী, মদদদাতা, পৃষ্ঠপোষক, অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহকারী এবং প্রশিক্ষকদের খুঁজে বের করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন – পিআইডি*

প্রধানমন্ত্রী নিজেকে একজন সন্ত্রাসী হামলার শিকার হিসেবে সন্ত্রাস ও সহিংস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধেও জিরো টলারেন্সহ নীতিতে বিশ্বাসী। বাংলাদেশে যেসব সন্ত্রাসী গ্রুপের উদ্ভব হয়েছে, তাদের নিষ্ক্রিয় করা, তাদের নিয়মিত অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে আঞ্চলিক সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম নির্মূল করার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার সফল হয়েছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীচক্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কিছু প্রান্তিক গোষ্ঠী তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পুনঃসংগঠনের মাধ্যমে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি মারাত্মক উন্নয়ন হুমকি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব না হলে, আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হবে না। নতুন উন্নয়ন এজেন্ডায় পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে আমাদের এই ধরিত্রী, এর প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে। আমাদের সামনে সামান্যই সুযোগ অবশিষ্ট আছে। এ বিশ্বকে নিরাপদ, আরও সবুজ এবং আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে আমাদের অবশ্যই সফলকাম হতে হবে।

আমরা মনে করি, টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে সার্ক, বিমসটেক জিইএস, বিসিআইএম-ইসির মত আঞ্চলিক সংস্থা প্রতিষ্ঠায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপালের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য আমরা অবকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অভিবাসন এবং মানব চলাচল আজ নতুনভাবে ইতিহাস এবং ভৌগলিক পরিসীমা নির্ধারণে নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডায় উন্নয়নের জন্য অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অভিবাসনের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, উৎস এবং গন্তব্য দেশ হিসেবে আমরা ২০১৬ সালে গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সাধারন অধিবেশনের ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বিগত কয়েক বছরে শান্তিরক্ষা এবং শান্তি নির্মাণ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গর্বিত। এ পর্যন্ত আমাদের সাহসী শান্তিরক্ষী

বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্বের ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশনে নিয়োজিত হয়েছেন। আমরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চসংখ্যক নারীপুলিশ সদস্য নিয়োজিত করার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি।

তিনি বলেন, চার দশকেরও বেশি আগে, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা ও আগ্রাসনমুক্ত একটি বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বান আজও আমাদের জাতীয় উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিম-লে সম্পৃক্ততার পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বর্তমানে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এগুচ্ছি যেখানে দারিদ্র্য, অসমতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি Johann Schneider-Ammann বৈঠক করেন – পিআইডি*

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এর আগে আমি 'রূপকল্প-২০২১' উপস্থাপন করেছিলাম। এর মাধ্যমে আমরা একটি মধ্যম-আয়ের, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। উন্নয়নের পথে যেভাবে আমরা দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছি, তাতে আমি বিশ্বাস করি,অচিরেই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, সম্প্রতি আমরা আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে স্থল এবং সমুদ্র সীমানা সমস্যা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। গত ৩১ জুলাই মধ্যরাতে আমরা ভারতের সাথে ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় করেছি। যার মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার রাষ্ট্রবিহীন ছিটমহলবাসী তাঁদের পছন্দের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাঁদের দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে কূটনৈতিক সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছি। একই চেতনায় আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের সামষ্টিক অঙ্গীকার অনুযায়ী এমন একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ উন্নত বিশ্ব গড়ে তুলি যেখানে দারিদ্র্য এবং অসমতা, সন্ত্রাস ও সহিংস জঙ্গিবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাত, এবং বিদ্বেষ ও বৈষম্য থাকবে না। আসুন, আমরা আমাদের নৈতিক সাহস এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সন্তান এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও নিরাপদ জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত রেখে যাওয়ার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করি।

জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে ভাষণ দেয়ার আগে জাতিসংঘ সদর দফতরে সাধারণ পরিষদের প্লিনারির একটি উচ্চপর্যায়ের সভায় শরণার্থী এবং অভিবাসীদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। অভিবাসী ও শরণার্থীদের অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে শেখ হাসিনা বলেন, অভিবাসন সংকট মোকাবেলায় বিশ্বকে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার ওপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, যে কোন পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা করতে হবে। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে জাতিসংঘ সদর দফতরে বৈঠক করেন মায়ানমারের 'স্টেট কাউন্সিলর' ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অং সান সুচি। এছাড়া, কমনওয়েলথের মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া জ্যানেট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এঁর আগে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘের 'এজেন্ট অব চেইঞ্জ' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' পুরষ্কার গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে তিনি প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বিশেষ খেতাবও পেয়েছেন। গ্লোবাল ইমপেক্ট ফোরামের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে এ পুরষ্কার ও খেতাব দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী এই পুরস্কার দেশের জনগণকে উৎসর্গ করেন। প্রাপ্ত পুরস্কার দেশের জনগণকে উৎসর্গ করে শেখ হাসিনা বলেন,'পরিবর্তনের সত্যিকার এজেন্ট হিসেবে বাংলাদেশের নারীদের জন্য এটি একটি স্বীকৃতি।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১ তম অধিবেশনে 'ওমেনস লিডারশিপ অ্যান্ড জেন্ডার পার্সপেক্টিভ অন প্রিভেন্টিং অ্যান্ড কাউন্টারিং ভায়োলেন্স এক্সট্রিমিজম' বিষয়ক সাইড ইভেন্টে ভাষণকালে বলেন, তারা শান্তি ও নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন এবং মানুষের প্রতি মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।আমরা অবশ্যই আমাদের অবস্থান থেকে এইচ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবো। আমরা সে সমাধানই চাই, নারীরা তাতে অবশ্যই অংশ নেবে।

প্রধানমন্ত্রী এসময় উগ্র চরমপন্থা প্রতিরোধে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারী নেতৃত্বের অন্তর্ভূক্তির নতুন পরিকল্পনার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমি সবার জন্য শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী, বিশেষ করে নারীদের জন্য এবং এটাই সমাজ থেকে সন্ত্রাস এবং উগ্র চরমপন্থা হটানোর ক্ষেত্রে গুরুতপূর্ণ হাতিয়ার। তিনি বলেন, আমি আমাদের মায়েদের এক একজনকে তাদের সন্তানদের জন্য রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপনের জন্য উৎসাহিত করে থাকি। দেশের প্রাইমারী স্কুলগুলোর শিক্ষকদের শতকরা ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষক এবং যারা এই সমাজে বিশেষ করে শিশুতোষ সমাজে মূল্যবোধ এবং সংযমের আলো ছড়াচ্ছে। আমাদের শিশুদেরকে অবশ্যই এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং উগ্র চরমপন্থার পথ থেকে দূরে রাখতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

নিবন্ধ

# বাংলাদেশের দারিদ্র্য জয় ও উন্নয়ন বিস্ময়

**সৈয়দ শাহরিয়ার**

দশ টাকা সের চাল বিতরণ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক। কুড়িগ্রামে ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী, খেতখামারে কাজ থাকবে না এমন মৌসুমে দিনমজুর, দুস্থ, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও বিবাহবিচ্ছেদের শিকার নারীদের মধ্যে প্রত্যেককে ১০ টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি চাল দেওয়া হবে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'একজন মানুষও যেন না খেয়ে থাকে না'।

বর্তমান সরকারের সাত বছর অর্থাৎ ২০০৯ থেকে ২০১৬, বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্র প্রমাণ করে বাংলাদেশ কীভাবে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার হাতে নিয়েছে ১০টি গণমুখী উদ্যোগ। যেমন– গ্রামের দারিদ্র্য বিমোচনে আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প', গৃহহীন মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ার জন্য 'আশ্রয়ণ প্রকল্প', ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সরকারের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ। বিনামূলে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি, সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম কর্মসূচি। সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য 'ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি। স্বাস্থ্যসেবা গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ কর্মসূচি, যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করতে সামষ্টিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিনিয়োগ বিকাশ কর্মসূচি ও পরিবেশ সুরক্ষা কর্মসূচি।

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ এক অনুকরণীয় নাম। এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলল বহুজাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে। সংস্থাটি বলেছে, সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগ আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশে হতদরিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। সংখ্যার হিসাবে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ এখন হতদরিদ্র। অথচ ২০০৫ সালে ছিল ৪৩.৩ শতাংশ। প্রায় অর্ধেক মানুষ তখন ছিল হতদরিদ্র। ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাংক বলছে– বাংলাদেশে হতদরিদ্র তারাই, যাদের দৈনিক আয় ১.৯০ ডলারের কম। অর্থাৎ এক ডলার সমান ৭৮ টাকা হিসেবে ১৪৮ টাকার কম। অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষকরা দাবি করছেন– বাংলাদেশ প্রতিবছর ৮.৮ শতাংশ হারে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারলে ২০৩০ সালে অতিদরিদ্রের হার ২.৯৬ শতাংশে নেমে আসবে। বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে দারিদ্র্য জয় করছে। বাড়ছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত যদি আমরা দারিদ্র্য হ্রাসের চিত্র লক্ষ করি, দেখব ২০১২ সালে অতিদরিদ্রের হার ছিল ১৬.৪ শতাংশ, ২০১৩

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কুড়িগ্রামে ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে কার্ড ও খাদ্যশস্য বিতরণ করেন –পিআইডি*

সালেও ১৬.৪ শতাংশ, ২০১৪ সালে ১৮.৭ শতাংশ, ২০১৫ সালে ১৩.৮ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে এসে দাঁড়ায় ১২.৯ শতাংশে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম দাবি করেন– কয়েক বছর ধরে সরকারের নেওয়া সমন্বিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণে দেশে অতিদরিদ্রের হার কমে এসেছে।

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ অক্টোবর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি*

শেখ হাসিনা সরকারের সাত বছরের বড়ো সাফল্য দারিদ্র্য জয়ের প্রচেষ্টা। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. শামসুল আলম দাবি করেন– দেশে প্রকৃত অর্থে অতিদরিদ্রের হার ১১.২ শতাংশ। তাঁর মতে, অতিদরিদ্রের হার বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলনের চেয়ে কম। বিশ্বব্যাংক অতিদরিদ্রের হার নিরূপণ করে ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে (পিপিপি)। সংস্থাটি একজন মানুষের আয় দিয়ে অতিদরিদ্র নির্ধারণ করে থাকে। আর সরকার অতিদরিদ্রের হার নির্ধারণ করে 'কস্ট অব বেসিক নিডস' (সিবিএন) বা ভোগ পদ্ধতিতে। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন, তার ভিত্তিতে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশের দারিদ্র্যের হার বলতে সেদেশের অতিদরিদ্রকে বোঝায়।

বাংলাদেশের 'উন্নয়ন বিস্ময়' দেখতে এসেছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। পাশের দেশ ভারত, পাকিস্তান ও ভুটানের চেয়ে বাংলাদেশ দরিদ্র জয়ে এগিয়ে আছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, পৃথিবীতে খুব কম দেশ দরিদ্র জয়ে এমন বিস্ময় দেখাতে পেরেছে। বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ এখন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিমের মতে, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দেশ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের কাছে অনুকরণীয়।

১৭ অক্টোবর বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস। জিম ইয়ং কিম দিবসটি বাংলাদেশে উদ্‌যাপন করেছেন। শুনেছেন বাংলাদেশের সাফল্যের গল্প। বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার সাফল্যের রহস্য তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন– '২০২১ সাল নাগাদ আমরা দারিদ্র্যের হার ৭ শতাংশ বা ৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে চাই।'

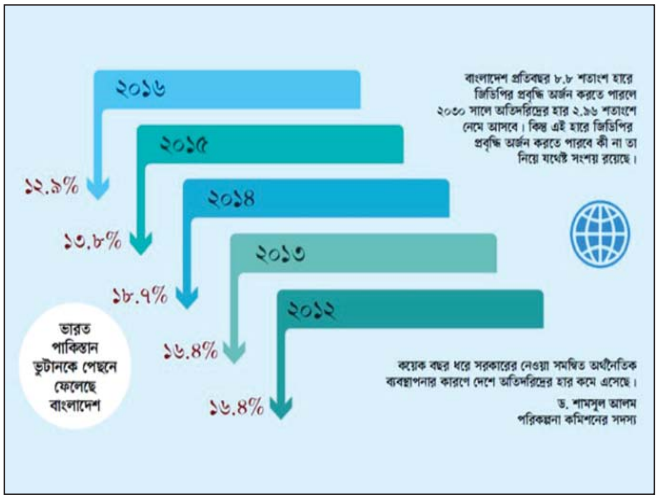


বর্তমানে দেশে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানি ও প্রবাসী আয় এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ গত সাড়ে ৭ বছরে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। বিনিয়োগ হার জিডিপি'র ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হয়েছে। দেশে সামাজিক নিরাপত্তা, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এরজন্য সরকার মোট বাজেটের জিডিপি'র ২ দশমিক ৩ শতাংশ ব্যয় করেছে। বর্তমান সরকার ২০১৬ থেকে ২০২০ মেয়াদি ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ১ হাজার ২শ ৩৩ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন টাকা। জ্বালানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যদি আমরা উন্নয়নের চিত্র লক্ষ করি দেখব– মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৪ সালে ১৪২তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত ৪টি সূচকেই বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো–কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নারীর ক্ষমতায়নই দারিদ্র্য দূরীকরণের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশে দারিদ্র্য জয়ের যে সাফল্য এর পেছনে কাজ করছে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ। বাংলাদেশে দারিদ্র্য জয়ের যে কৌশল এর পেছনে কোন কর্মপদ্ধতি কাজ করছে তা আজ জানতে আগ্রহী বিশ্বব্যাংক। আশার কথা এই যে, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বহুবিধ দুর্যোগ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নিবন্ধ

# তথ্যই শক্তি তথ্যই প্রগতি

সুফিয়া বেগম

২৮ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'তথ্য পেলে মুক্তি মেলে, সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে'। এ দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন 'তথ্যই শক্তি'। সঠিক তথ্য অমূল্য সম্পদ। তথ্য মানুষকে সর্বদাই সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে'।

তথ্য অধিকারের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংবিধান দ্বারা সংবদ্ধ। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা অপরিসীম। গণতান্ত্রিক অধিকার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য জানার অধিকার একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পাস করা হয়। এই আইনের আওতায় তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। এতে জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেশের গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় বর্তমান সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ৪১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমোদনের পাশাপাশি বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র ও ৩২টি কমিউনিটি রেডিও। সহজতর হয়েছে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার। গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। যে-কোনো সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা সেবা ইত্যাদি সম্পর্কে যে-কোনো নাগরিক যদি তথ্য পেতে চান, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সে তার প্রাপ্য তথ্য পেতে পারেন। নামমাত্র মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে একজন নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পেয়ে থাকেন।

স্বচ্ছ প্রশাসন ও স্বচ্ছ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের কোনো বিকল্প নেই। তথ্য অধিকারের ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগে ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে দেশে সবগুলো ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রায় ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। তথ্যপ্রাপ্তির সব ধরনের সুবিধা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্রত্যাশিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতাকে নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তারই আলোকে তথ্য অধিকার আইন সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে দুর্নীতি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং নাগরিকদের সক্রিয়

*রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি*

অংশগ্রহণ ছাড়া তথ্য অধিকার আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে সর্বস্তরের জনগণকে এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে হবে। উন্নয়ন যোগাযোগ ছাড়া কোনো সমাজ, কোনো রাষ্ট্রের বিকাশ চিন্তা করা যায় না। প্রতিদিন তথ্যের আদান-প্রদান বাড়ছে। সারা পৃথিবী আজ গ্লোবাল ভিলেজ। তথ্যপ্রবাহ যোগাযোগ বাড়ায়। যোগাযোগ রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে যোগসূত্র তৈরি করে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের এবং আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশির দশক থেকে বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে নতুন মাত্রা। বর্তমান বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থায় (New World Economic order) যোগাযোগ বিপ্লব ঘটিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন যোগাযোগ রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণকে এক মেরুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। উন্নয়ন যোগাযোগের অন্যতম উপাদান অবাধ তথ্যপ্রবাহ।

খবর আদান-প্রদানই তথ্য। তথ্য মানুষের জীবনের চাহিদা মেটায়। বর্তমান বিশ্বে তথ্যের ব্যবহারিক মুখ্য ও বিনিময় মূল্য দুটোই রয়েছে তাই তথ্য পণ্য। বর্তমান যুগকে ICT'র যুগও বলা হয়। আমরা প্রতিদিন পরিবার, সমাজে, অফিস-আদালতে, হাটে, মাঠে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমনকি পথ চলতে বিনিময় করি। তথ্য সরবরাহ ও তথ্য গ্রহণ আমরা জাতীয় পর্যায়েও লক্ষ করি। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন জাতির উদ্দেশে। ভাষণের মাধ্যমে তিনি কিছু মেসেজ বা বার্তা দেন জনগণকে। পহেলা বৈশাখ, ঈদ, বড়দিন, বৌদ্ধপূর্ণিমাসহ বিশেষ সময়ে তিনি জনগণকে শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও জাতীয় জীবনে বিশেষ সময়গুলোতে সংবাদপত্র, ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও বেতারে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেন জনগণের উদ্দেশে। এই সরবরাহ থেকে আমরা তথ্য সম্পর্কে অবহিত হই এবং কর্মজীবনে উপকৃত হই নানাভাবে।

**তথ্য কেন?**

জ্ঞানের জন্য তথ্য। তথ্য আমরা পাই একমুখী যোগাযোগ ও দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যমে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে আবহাওয়াসহ নানামুখী খবর শুনি ও দেখি। আগামীকাল জলোচ্ছ্বাস কিংবা প্রবল ঝড়বৃষ্টি হবার আশঙ্কা যদি থাকে কিংবা প্রবল বর্ষণের পরে যদি রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি দিন পাবার সম্ভবনা থাকে, প্রচণ্ড খরা বা অনাবৃষ্টির পরেও যদি 'লু' বইবার আশঙ্কা থাকে আগামী কয়েকদিনে তাও আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে সেই তথ্য জানতে পারি।

তথ্য আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যের প্রয়োজন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ১১৩টি দেশে 'তথ্য অধিকার আইন' জারি করা হয়। আজ থেকে ২৫০ বছর পূর্বে ১৭৬৬ সালে বিশ্বে তথ্য অধিকার স্বীকৃতি পায় সুইডেনে এবং ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে তথ্য অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৬ সালে Freedom of Information act প্রণয়ন করে।

জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগাতে সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়ন উদ্‌বোধনকালে বলেন, 'তথ্য অধিকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। তিনি আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ৭০%-৮০% জনগণ মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে'।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের যুগে তথ্য লুকানোর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি। একসময় অফিস-আদালতের তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা ছিল। আজ তথ্য জানা একটি অধিকার। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন ৭ বছরে সমাজে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে এ বিষয়টি গবেষণার দাবিদার। তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা জনগণকে জানানো একা সরকারের প্রতিনিধিদের নয়। এক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

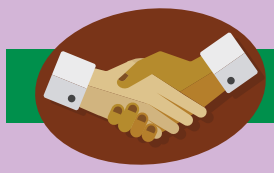

নিবন্ধ

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ১৯ বছর

# পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস, জীবনের জয়গান

**মাহবুব রেজা**

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম আজ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করত। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা বিদ্যমান ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে এ সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাকমা রাজার প্রতিনিধি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন সংবলিত চার দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু তাদের এ অনৈতিক দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে পালটা বাঙালিকরণের প্রস্তাব দেন। তারা বঙ্গবন্ধুর পালটা দাবি নাকোচ করে দেন। শুধু তাই নয়, তারা চাকমা নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে জনসংহতি সমিতি এবং ১৯৭৩ সালে তাদের সামরিক শাখা শান্তি বাহিনী গঠন করে। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যাটি এভাবেই চলছিল এবং তেমন আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতায় আসা সেনাশাসক জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা তৎকালীন পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ ও সংঘাতময় করে তোলে। দিনের পর দিন শান্তিবাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলায় আমাদের বাংলাদেশি অনেক সৈনিক সেখানে শহিদ হয়েছেন।

এভাবেই দিনের পর দিন দীর্ঘতর হচ্ছিল পাহাড়ে হত্যার সংখ্যা। রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল পাহাড়ি জনপদ। পাহাড়ে তখন ছিল না শান্তির সুবাতাস। বিশ্বাস ছিল পাহাড়ি আর বাঙালিদের মধ্যে। সর্বত্রই ছিল অবিশ্বাসের সুর। উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছিল। পাহাড়ের মানুষও এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি চাইছিল।

অবশেষে ১৯৯৬ সালে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে জাতীয় কমিটি গঠন করে উপজাতীয় প্রধানের সাথে আলোচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এলক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে ১ম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তির খসড়া প্রণয়ন করা হয়। অবশেষে, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে



*প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন*

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বর্ণিল বেলুন উড়িয়ে এবং গুচ্ছ গুচ্ছ শান্তির শ্বেত-কপোত আকাশে উন্মুক্ত করে বেশ সাড়ম্বরতার ভেতর দিয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। শান্তিচুক্তির কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এমনকি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিলেন। শুরু থেকেই এই চুক্তি বাংলাদেশের বহুল আলোচিত চুক্তিগুলোর একটি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

চুক্তি মোতাবেক ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের তালিকা প্রদান করা হয়েছিল এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ থেকে ৫ মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত ৪ দফায় ১৯৪৭ জন সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সদস্য শেখ হাসিনা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ৮৭৫টি অস্ত্রসহ ২ লাখের অধিক গোলা-বারুদ তারা জমা দিয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ৫ মার্চ সর্বশেষ দলের আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তি বাহিনীর পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটে।

শান্তিচুক্তির বৈধতা, সাংবিধানিক বিতর্ক, জেএসএস বা সন্তু লারমা পার্বত্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে কিনা এসব নিয়ে বিরোধী শিবির নানা ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি করলেও একথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, এ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সন্ত্রাসী ও দুর্ধর্ষ গেরিলাদের একটি বড়ো অংশকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুঝমান পরিস্থিতি চুক্তির আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে যে-কোনো মাপকাঠিতে তা অস্বীকার্য। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক ও পর্যটন খাতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু বিশ্লেষকের মতে, যে-কোনো বৃহৎ কাজের শুরুতে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে। সে অর্থে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতিসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে একটি 'গুড বিগিনিং' বা 'শুভারম্ভ' বলা যায়।

## দুই

১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলেও তৎকালীন বিরোধী দলের তীব্র আন্দোলনের মুখে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খুব বেশি এগিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে তারা ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য শান্তিচুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়ন করবে। নির্বাচনে জয়লাভের পর বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিতে সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রিগেড ও ৩৫টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়েছে। মাত্র ৪টি সেনা ক্যাম্প ছাড়া সরকারের এ ঘোষণা প্রায় পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে। ভূমি সমস্যার সমাধানে সরকার একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন করেছে। পুনর্গঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্স। শান্তিচুক্তির এক যুগের পথ পরিক্রমায় সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো সকল সীমাবদ্ধতা ও বিতর্ক সত্ত্বেও শান্তিচুক্তি বাস্তবতাকে পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই মেনে নিয়েছেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস রাখার কথা বলা হয়। শান্তিচুক্তির ঘ খণ্ডের ১৭(ক) ধারায় বলা হয়েছে, 'সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন'।

শান্তিচুক্তি নিয়ে সরকারের সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিভিন্ন মহল নানাভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকার খুব পরিষ্কার। সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই চুক্তি বাস্তবায়নে অত্যন্ত আন্তরিক। বিশেষ করে সেনানিবাস স্থাপন নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিতর্ক তৈরির অপচেষ্টা করছে যা বোদ্ধামহলের কাছে সুস্পষ্ট। শান্তিচুক্তিতে ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ৪টি ব্রিগেড বাদে বাকিগুলো সব সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কি শান্তিচুক্তি সংশোধনের কথা বললেন? এটাও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ একটি ভুল বোঝাবুঝি। কেননা শান্তিচুক্তিতে ৬টি স্থায়ী সেনানিবাসের কথা বলা হয়েছে। এই ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস কীরূপে সেখানে অবস্থান করবে– ডিভিশন আকারে, ব্রিগেড আকারে না ব্যাটালিয়ন আকারে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই। এই অপশনটি রাষ্ট্রের হাতে রয়ে গেছে। রাষ্ট্র প্রয়োজন মতো তা ব্যবহার করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অর্থাৎ ৪টি ব্রিগেড ও শান্তিচুক্তি সমন্বয় করলে আমরা দেখতে পাবো, তিন পার্বত্য জেলা সদরে তিনটি ব্রিগেড রয়েছে। এর বাইরে গুইমারা ব্রিগেড

দীঘিনালায় সরে গেলে রুমা ও আলীকদমে দুইটি ব্যাটালিয়ন থাকতে পারে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ৪টি ব্রিগেডের মধ্যে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান ব্রিগেডে ৫ ব্যাটালিয়ন করে সৈন্য রয়েছে, গুইমারায় রয়েছে ৩ ব্যাটালিয়ন। সব মিলিয়ে ১৮ ব্যাটালিয়ন সৈন্য রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। একটি ব্যাটালিয়নে গড়ে ৭০০ করে সৈন্য ধরলে ১৮টি ব্যাটালিয়নে ১২-১৩ হাজার সৈন্য রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফর্মেশন অনুযায়ী ৩-৫টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে একটি ব্রিগেড গঠিত হয়। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪টি ব্রিগেড থাকলে সেখানে ১২-২০ ব্যাটালিয়ন সৈন্য থাকতেই হবে। ব্যাটালিয়নগুলো আবার গড়ে ওঠে কতকগুলো সাবজোনের সমষ্টিতে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, এই জোন, সাবজোনগুলো কোথায়, কীভাবে অবস্থান করবে?

শান্তিচুক্তির ঘ খণ্ডের ১৭(ক) ধারায় আরো বলা হয়েছে, 'আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে'। উল্লিখিত বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে বা জাতীয় অন্যান্য দরকারে রাষ্ট্র প্রয়োজনানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের যেখানে প্রয়োজন যে-কোনো ফর্মেশনে সেনাবাহিনী রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রে চারটি ব্রিগেড বা ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস বিবেচ্য নয়– রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বিবেচ্য। একই ধারায় আরো গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো, সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনার শর্ত বাস্তবায়িত হতে হবে 'জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে'।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সরকার যে-কোনো ধরনের অবস্থানে যেতে বদ্ধপরিকর। শান্তিচুক্তিকে বিঘ্নিত করতে একটি মহল দীর্ঘদিন থেকে আবদার করে আসছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে? এর পেছনে তারা কোনো যৌক্তিক ব্যখ্যা দিতে পারছে না। সরকার এবং দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষ এই মহলটির গোপন বাসনা বুঝতে পেরেছে। সরকার মনে করছে, সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অপরিহার্য প্রয়োজনে। এখানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দাবি করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী গিয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে সরকারি নির্দেশে। সাপ, মশা, জোঁক, হিংস্র বন্যপ্রাণী, দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিকূল পরিবেশ, বৈরী ভূ-প্রকৃতি ও খাদ্যাভ্যাসের সাথে মোকাবিলা করে এবং পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের হুমকি ও অপতৎপরতার মুখে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অটুট রেখেছে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষকের অনেকে এ কথা বহুবার বলেছেন যে, সেনাবাহিনী না থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বহু আগেই বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এ কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ৩৫১ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৩৮৪ জন এবং অন্যভাবে ২২৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারপরও সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরে আসেনি। এখনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রাষ্ট্রীয় নির্দেশ পালনে নিয়োজিত। শুধু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায়ই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী অপারেশন উত্তোরণের আওতায় অসংখ্য উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত। এরমধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্রি বিশেষায়িত ও সাধারণ চিকিৎসা সেবা, ব্লাড ব্যাংক পরিচালনা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৭টি বিনামূল্যে চক্ষুশিবির পরিচালনা করে। এতে ৩,৫২৫ জন লোক সেবা গ্রহণ করে– যার মধ্যে ২,১১৮ জন পাহাড়ি ও ১,৪০৭ জন বাঙালি। একই বছরে ৮২৮টি বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পরিচালনা করে। এতে ১,২৯,১৪৯ জন সেবা গ্রহণ করে। এরমধ্যে পাহাড়ি ৫৪,৫৯৬ জন এবং বাঙালি ৭৪,৭০৩ জন রয়েছে। গত বছর সাজেকের শিয়ালদহে হঠাৎ করে ডায়রিয়া মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত ডাক্তার পাঠানো জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্গম শিয়ালদহে স্বাভাবিকভাবে ডাক্তার ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠানো যেমন কষ্টকর ছিল, তেমনি নিরাপত্তার কারণে ডাক্তারগণও সেখানে যেতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সেখানে ডাক্তার, চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর পাশাপাশি ডাক্তারদের নিরাপত্তা বিধান করে মহামারি রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। ২০১৫ সালে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৫,৯৮০ জনের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, ৮৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা সংস্কার, ২৬টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ২৭,৭৩৩ জনকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, ৩,৯০৮ জনকে আর্থিক অনুদান, ১২২টি ধর্মীয় উপাসনালয়কে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা, ৪৮টি ব্রিজ ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ ও সংস্কার, ১৪০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা, ৩৬১টি উন্মুক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনসহ ৯২টি অন্যান্য সহায়তা করে। প্রত্যেক বছরই এই সেবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ব্যাপক অবদান রয়েছে। এরমধ্যে বিদ্যালয় নির্মাণ, সংস্কার, পরিচালনা, শিক্ষকদের বেতন প্রদান, বই, খাতা, কম্পিউটার, পোশাকসহ বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী প্রদান, ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা

প্রদান, সহশিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা ইত্যাদি রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের বেকার তরুণদের উন্নয়নে নানা ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, কম্পিউটারসহ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করে থাকে। মহিলাদের জন্য নানা ধরনের আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, কম্পিউটার ও সেলাই মেশিন বিতরণ করে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কারের পাশাপাশি ফ্যান, লাইট, চার্জার, মাইক বিতরণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে সারা বছর বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করে থাকে। একইভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী বিতরণ করে থাকে। গভীর নলকূপ স্থাপনসহ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে ফিল্টার প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম, দরিদ্র জনগণের বসতঘর নির্মাণ, হাঁস-মুরগি-ছাগলের খামার ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা, যাত্রী ছাউনি নির্মাণ, সৌর প্যানেল প্রদান, সাংবাদিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, কৃষি সরঞ্জাম, সার, বীজ, কীটনাশক বিতরণ করে থাকে। পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে-কোনো উদ্ধার ও সংস্কার তৎপরতায় সেনাবাহিনী সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে সেনাবাহিনীর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। দুর্গম পাহাড়ে সড়ক নির্মাণ, সংস্কার এ কাজে জড়িতদের নিরাপত্তা প্রদান, পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নিরাপত্তা প্রদানের কাজ করে থাকে। তিন পার্বত্য জেলার ১,৫৩৫ কি.মি. রোড নেটওয়ার্কের অর্ধেকই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নির্মাণ করেছে। আলীকদম-থানচি সড়ক, সাজেক, নীলগিরি সড়কের মতো উঁচু সড়ক নির্মাণ করে দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পর্যটন খাতের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদক উৎপাদন ও পাচার, জঙ্গি তৎপরতা দমন, অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস দমনে অসামান্য ভূমিকা পালন করছে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের শর্তানুযায়ী এ পর্যন্ত একটি ব্রিগেডসহ ২৩৮টি বিভিন্ন ধরনের সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই অর্জন ধরে রাখতে সাধারণ দেশপ্রেমিক মানুষের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্বকে অটুট রাখা। পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি রক্ষায় সেনাবাহিনী অতন্দ্র প্রহরির ভূমিকা রেখেছে শুরু থেকেই। দেশের প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে দেশ রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে এটাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্রমবর্ধমান অপতৎপরতার কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের একাংশকে ক্যান্টনমেন্টের আয়েশি জীবন পরিত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম বৈরী পরিবেশে জীবনযাপন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। এ প্রয়োজন যতদিন অনুভূত হবে ততদিন সেনাবাহিনী প্রচলিত আইনের আওতায় দেশের মধ্যে যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনভাবেই অবস্থান করবে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইনসার্জেন্ট এলাকাগুলোতে এভাবেই সেনাবাহিনী অবস্থান করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্তের ওপারে ভারতের সেভেন সিস্টার্স ও মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের ইনসার্জেন্ট দমনে সে দেশের সেনাবাহিনী একইভাবে অবস্থান করছে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা কোনো ছেলের হাতের মোয়া বা হেলাফেলার বিষয় নয়, যে-কোনো উপায়ে তা রক্ষা করতে হবে।

তিন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলছেন, দীর্ঘদিনের বিরোধ নিষ্পত্তি করে সম্পাদন করা শান্তিচুক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। দীর্ঘদিনের জাতীয় সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে হাসিনা সরকার শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতি এবং তার সামরিক শাখা 'শান্তিবাহিনী' সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে দীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে আসছিল। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কোনো সামরিক এবং বেসামরিক সরকারই এ সমস্যা সমাধানে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। শেখ হাসিনা সরকার এ দীর্ঘ সংঘাতময় পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যে যুগান্তকারী ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তারা সারা পৃথিবীব্যাপী বহুল প্রশংসিত হয়েছে।

পার্বত্য চুক্তির ১৯ বছর হতে চলল। দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের অবসানকল্পে এই চুক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে আজ শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রে পার্বত্য চুক্তিকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাদের বিশ্লেষণে বলছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকার এককভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের সাফল্যের একমাত্র দাবিদার। তারা আরো বলছেন, শেখ হাসিনার গভীর ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার কারণে সম্ভব হয়েছিল পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও তার ধারাবাহিক বাস্তবায়ন।

*লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক*

নিবন্ধ

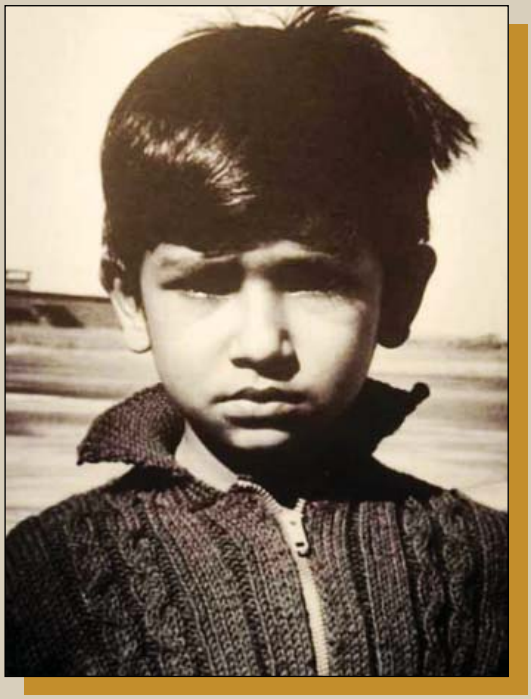

## বিশ্ব শিশু দিবস

# শিশু অধিকার ও শেখ রাসেলের জন্মদিন

**খালেক বিন জয়েনউদদীন**

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার আমরা 'বিশ্ব শিশু দিবস' উদ্‌যাপন করি এবং আমাদের দেশে 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' শুরু হয় ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে।

বিশ্ব শিশু দিবস আন্তর্জাতিক হলেও পৃথিবীর দু-একটি দেশে নির্ধারিত দিবসটির প্রতি শ্রদ্ধা-স্মরণ রেখে তারা বিশ্ব শিশু দিবস উদ্‌যাপন করে। এছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে রয়েছে জাতীয়ভাবে কোনো দিনকে বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করার নিয়ম। যেমন আমরা বিশ্ব শিশু দিবস ছাড়া জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– এর জন্মদিন, যে দিনটি 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে চিহ্নিত।

কিন্তু পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে এই দিবসটি ভিন্ন তারিখে উদ্‌যাপন করে। আবার আন্তর্জাতিক সংগঠন 'সিমিয়া' বিশ্ব শিশু দিবস (UNIVERSAL CHILDREN DAY)- এর পরিবর্তে বলে 'আন্তর্জাতিক শিশু দিবস' (INTERNATIONAL CHILDREN DAY)। এই সংগঠনটির দেশগুলো পয়লা জুন দিবসটি পালন করে। আর বিশ্ব শিশু দিবস অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার ছাড়া অন্যদিন পালন করে জার্মানি-সেপ্টেম্বর, মিসর-জানুয়ারি, জাপান-মে, ঘানা-নভেম্বর এবং যুক্তরাজ্য-জুন মাসে। এসব রাষ্ট্র নির্ধারিত মাসের সুবিধামতো একটি দিন বেছে নেয়।

বিশ্ব শিশু দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ কিংবা কন্যাশিশু দিবসের মূলে রয়েছে শিশু অধিকারের প্রশ্ন। যে শিশু মানবজাতির উত্তরাধিকারী, তার জন্মগত অধিকারকে যখন খর্ব করা হয়, তখনই বিবেকবান মানুষ সোচ্চার হন মানব শিশুর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে। প্রথম মহাযুদ্ধে শিশু মৃত্যুর হার দেখে মানুষ নিষ্পাপ শিশু হত্যার প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি। শুধু জেনেভা শিশু অধিকার-১৯২৪ ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শিশু–কিশোরদের ব্যাপক প্রাণহানির সংখ্যা দেখে বিশ্বের বিবেকবান সকল মানুষ আঁতকে ওঠেন। নিরাপদ শিশুর অকালমৃত্যুতে তারা বিভিন্ন দেশে বৈঠক করেন এবং এ বিষয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের দ্বারস্থ হন। অবশেষে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ নীতিমালা ও ঘোষণা অনুযায়ী শ্রম অধিকারের স্বীকৃতিতে শিশু অধিকার সনদ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত হয়।

এই সনদের মূল কথা হলো মৌলিক মানবাধিকার এবং মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তথা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য হচ্ছে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা প্রদান করা। পাশাপাশি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পারিবারিক সুপরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্কতার কারণে জন্মের আগে বা পরে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত ৫৪টি অনুচ্ছেদের প্রতিটি ধারা স্বাক্ষরকারী দেশ বা রাষ্ট্রসমূহ মানতে বাধ্য। শিশু অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রসমূহকে শিশুর খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বিকাশ ও বিনোদনসহ সকল প্রকার অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ প্রণীত হবার পর জাতিসংঘে কোনোদিন শিশুদের উপস্থিতিতে শিশু বিষয়ক কোনো অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০২ সালের মে মাসে প্রথম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৯ জন রাষ্ট্রপ্রধান, ১৯০টি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিনিধি, ৫ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, ৪০০ জন শিশু-কিশোর এবং ১১৭টি দেশের সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধি অংশ নেন। শিশু–কিশোররা অংশ নেয় আনুষ্ঠানিক বৈঠক ও সম্পূরক অধিবেশনে। এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এবং সুনির্দিষ্ট ও মেয়াদভিত্তিক লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়। শুধু তাই নয়, উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মৌলিক কাঠামো অনুসরণের অঙ্গীকারও ঘোষণা করেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং আমাদের বাংলাদেশের শিশু আইন-৭৪, জাতীয় শিশুনীতি-১৯৯৪ ও ২০১১-এর কোনো ধারা বা নীতি অনুসরণ করছি না। গোটা বিশ্বে শিশু অধিকার হরণ করা হচ্ছে। জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ প্রতিবছর 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনটিতেই হদিস মেলে গোটা বিশ্বের হালহকিকত অর্থাৎ আমাদের গোটা বিশ্বের শিশুরা কেমন আছে– তার প্রামাণ্য খবর।

আমরা জোর গলায় বলতে পারি না– শিশুরা ভালো আছে। গোটা বিশ্বে শিশু হত্যা বন্ধ হয়েছে। শনৈঃ শনৈঃ শিশু উন্নয়ন হচ্ছে। এখনো বিশ্বের অনেক দেশে শিশু পাচার হচ্ছে, শরণার্থী হচ্ছে, যুদ্ধে মারা যাচ্ছে এবং শিশু নির্যাতন আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ভুলে গেছি জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদের কথা– প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকারকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতি দেবে এবং অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র শিশুর বেঁচে থাকার ও উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু মানব সভ্যতা এ ক্ষেত্রে পরাজিত। মানবতার শত্রুরা প্রবল শক্তিধর। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিষয়টি তদারকি করে ইউনিসেফ বা জাতিসংঘের শিশু তহবিল। এই সংস্থাটি এখনো পরাশক্তির কাছে অপরাজেয় নয়।

আমাদের দেশেও শিশু অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করা যায়নি। পাকিস্তানি সৈন্যরা একাত্তরে নির্বিচারে শিশু নিধন করেছে। বঙ্গবন্ধু তাই আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের বিশেষ বিধান প্রণয়নের অধিকার দিয়েছেন এবং সেলক্ষ্যেই ১৯৭৪ সালে তাঁরই নির্দেশে 'শিশু আইন- ১৯৭৪' প্রণীত হয়। আর এর আলোকেই বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে জাতীয় 'শিশুনীতি-২০১১'।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুর সুরক্ষা হয়নি। শিশু অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি। বিগত বছরগুলোয় আমরা হারিয়েছি খুলনার শিশু রকিব, সিলেটের সাঈদ, রাজন এবং রাজীবকে। এই কদিন আগে আমরা হারালাম উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্রী রিশাকে। শুধু হত্যাই নয়, অনেক শিশুকে অপহরণ করা হয়, অনেককে পাচার করা হয় প্রলোভন দেখিয়ে। আবার শিশুশ্রম নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কারখানায় শিশুদের নিয়োগ করে পেটে বাতাস ঢুকিয়ে অকারণে তাদের প্রাণসংহার করা হয়। শিশুর বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়।

আমরা ভুলে যাই আমাদের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১-এর এক নম্বর ক্রমিকের কথা। এক নম্বর ক্রমিকে বলা হয়েছে–সকল প্রকার সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের ওপর সহিংসতা, নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। আর এর ব্যত্যয় ঘটলে শিশুনীতির পরবর্তী তিনটি ক্রমিকে শিশু নির্যাতনকারীদের আইনের আওতায় এনে বিচার করার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আমাদের মধ্যে জনসচেতনতার খুবই অভাব। আবার আইনের ফাঁকফোকরে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। আমাদের মোট জনসংখ্যার ৪৫% শিশু ও কিশোর। এদের সার্বিক উন্নয়ন তথা শিশু অধিকার বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রসহ সকল বিবেকবান নাগরিকের কর্তব্য।

বিশ্ব শিশু দিবস পালনের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেও একটি শিশুর বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে মানুষরূপী একদল নরঘাতক। এই শিশুটি এখন আমাদের কাছে চির পরিচিত। হ্যাঁ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান। এই শিশুটির নাম শেখ রাসেল। ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। রাসেলের বেঁচে থাকার অধিকার জন্মগত। তার সুরক্ষা দেওয়া মানবিক কর্তব্য। কিন্তু ধর্মের ও শাস্ত্রের বাণী খুনিদের কাছে তুচ্ছ। অকালে তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। একটি নিষ্পাপ শিশু, বয়স প্রায় ১১ বছর। এই পৃথিবী ছিল তার কাছে স্বপ্নের জগৎ। মা-বাবা, ভাইবোন, ভাবি এবং আত্মীয়-স্বজন ও স্কুল ছিল সেই জগতের পরিধি। বাবার সাথে সে বিদেশ গিয়েছে, বন্ধুর সাথে খেলেছে। আবার স্বগ্রামে গিয়ে সবুজের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছে। তার গণ্ডি খুব বড়ো ছিল না। তবে স্বগৃহে বিপুল লোকের সমাগমে সে অবাকই হতো। কিন্তু তাকে অকালে ঝরে পড়তে হলো মানবসৃষ্ট কারণে। তার কোনো অপরাধ ছিল না। সে বাঁচার জন্য খুনিদের কাছে কাকুতিমিনতি করেছিল। খুনিরা তা অগ্রাহ্য করে মানবতাকে পদদলিত করেছে। এসব নরপিশাচরা চিরকাল মানব সভ্যতার শত্রু হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের নামের ওপর চিরকাল থুথু ছিটাবে মানুষ।

শুধু শেখ রাসেলই নয়, রাসেলের বেঁচে থাকার অধিকারকে যেদিন খুন করা হয়, সেই পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট একই সময়ে অন্য দুটি বাড়িতে হত্যা করা হয় সুকান্ত আবদুল্লাহ, আরিফ আবদুল্লাহ, বেবী সেরনিয়াবাত এবং মোহাম্মদপুরের একটি বাসায় বড়োদের সাথে নাম না জানা শিশু। এরা কী অপরাধ করেছিল? রাসেলের জন্মদিনে এমন প্রশ্ন চিরকালই মানুষের মনে জাগবে।

বিগত বছরগুলোয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, একশ্রেণির মানুষ গণতন্ত্রের ছায়ায় পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মানুষের সাথে শিশু হত্যা করেছে। এরা আগুন-সন্ত্রাসী এবং মানবতার চিরশত্রু। সৃষ্টির আদিতে শিশুদের ফুলের সাথে, স্বর্গের দেবদূতের সাথে তুলনা করা হতো। কোনো বিপর্যয়েই তাদের পড়তে হতো না, বরং তাদের সুরক্ষা দেওয়া হতো। তখন তো সনদ বা কোনো নীতিমালাই ছিল না। ছোটোদের ওপর কোনো দৌরাত্ম্য ছিল না। এখন সভ্য সমাজে শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হ্রাস পাবে।

তাই আমাদের বিশ্ব পরিচালনার স্বার্থে শিশুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তা-চেতনায় এবং উপযুক্ত পরিবেশে গড়ে তুলতে হবে। মায়া-মমতা বা আদর শিশুদের মৌলিক চাহিদার মতো। এক কথায় এগুলো শিশুদের অধিকার। পাশাপাশি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শৈশব থেকেই দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির আধারে শিশুদের নিরাপদে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। অভিভাবক হিসেবে রাষ্ট্র এবং আমাদের এটাই একান্ত কর্তব্য।

*লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক*

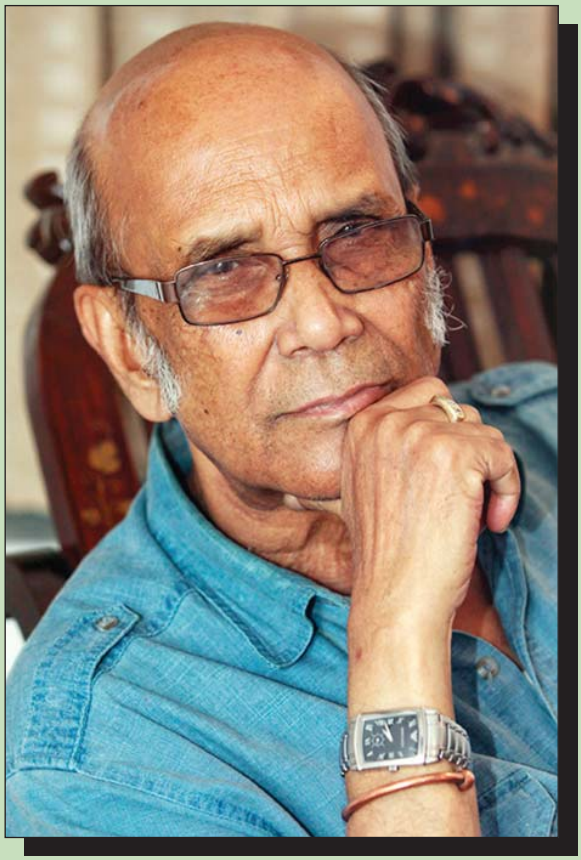

# সব্যসাচী লেখক সৈয়দ হক

সাইয়েদা ফাতিমা

চলে গেলেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ হক।

তিনি কী ছিলেন না? শুধু কি কবি। দেশজুড়ে বৈশাখি পঙ্‌ক্তিমালার দোলা আজও পাওয়া যায় তাঁর গদ্যশিল্পে। ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি তাঁর গদ্য শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়। ছোটোগল্পে অর্জন করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার। তখন বয়স মাত্র ২৯। নাটক, উপন্যাস, সিনেমা, কাব্যনাটিকা কোথায় সৈয়দ শামসুল হক অনুপস্থিত? ছিলেন সাংবাদিকও। তিনি বেঁচে আছেন! থাকবেন।

১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এক অঞ্চল কুড়িগ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৫১ সালে লেখার জগতে আসেন তিনি। দীর্ঘ ৬১ বছর লেখালেখির জগতে সরব পদচারণা করে গেছেন অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। লেখালেখির শুরুতে অখ্যাত সৈয়দ হককে এক নবীন লেখকের সব রকম যাতনা ও নিগ্রহ সইতে হয়েছে। শুরুর কালে বিউটি বোর্ডিং-এ নিজের লেখা পড়ে পার পাননি। সমালোচনার তীব্রতায় নবীন শামসুল হক একসময় চিরতরে লেখা ছাড়ার কথাও ভেবেছিলেন। তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন সাহিত্য জগতে কেউ কাউকে জায়গা দেয় না। অর্জন করে নিতে হয়। তিনি সেটা পেরেছেন।

প্রথম জীবনে গাঢ় বন্ধুত্ব জমে ওঠে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ফজলে লোহানী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ প্রমুখের সঙ্গে। গত দিনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ বেশ কয়েকটি ঈদ সংখ্যার স্মৃতিচারণে প্রকাশিত হয়েছে। শুরু করেছিলেন কয়েক বন্ধু মিলে অগত্যা। ছিল সেসব দিনের স্বাক্ষর। একাধারে লিখেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতি, গান। ধ্রুপদী সাহিত্যের বাংলা অনুবাদে ছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। কবি হেলাল হাফিজ তাঁর প্রয়াণের পরে প্রতিভার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মুজতবা আলী এবং বুদ্ধদেব বসুর পরে বাংলা সাহিত্যের সবচাইতে প্রতিভাবান সাহিত্যিক হিসেবে সৈয়দ হককে উল্লেখ করেছেন। কবি হেলাল হাফিজ বলেন, তাঁর গদ্য শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হলে অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ধারাবাহিক কলাম 'মার্জিনে মন্তব্য' ও দৈনিক সংবাদে 'হৃৎ কলমের টানে' এবং 'কথা সামান্যই'– এর উল্লেখ করেন। কবির ভাষায় – শুধু এই তিনটি কলামের যে-কোনো একটি পড়লেই বোঝা যায় তাঁর কব্জির জোর।

বিবিসিতে প্রচারিত সৈয়দ হকের ধারাবাহিক কাব্যনাটিকা চসারের *কান্টারবেরী টেলস* বাংলাদেশ ও ভারতজুড়ে বিশাল বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠীকে টেনে রাখত প্রতি সপ্তাহের সন্ধ্যায়। মনে রাখতে হবে তখন ২৪ ঘণ্টা টিভি চ্যানেল ছিল না। ছিল না সিরিয়াল নাটক। অর্থাৎ বিভিন্ন কৃৎকৌশল ছাড়াই শুধুমাত্র কণ্ঠের ধারে, লেখার গুণে দর্শক-শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধরে রাখার অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব সে অর্থে তাঁর একার। তবে *কান্টারবেরী টেলস* ১৯৭০- এর দশকে প্রচারিত হয়। যখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তিনি তখন খ্যাতিমান। তাঁর অর্জিত পুরস্কারের মধ্যে দেখা যায়–আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), অলক্ত স্বর্ণপদক (১৯৮২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩) ও একুশে পদক (১৯৮৪)। সৈয়দ শামসুল হক ধীরে ধীরে হয়ে যান সৈয়দ হক।

বিভিন্ন সময় দৈনিক পত্রপত্রিকায় নামে ও বেনামে কলাম লিখেছেন ধারাবাহিকভাবে। তিনি উচ্চারণে চলতি বাংলায় বিশ্ব নাগরিক সৈয়দ হকের উপস্থাপনা মুগ্ধ করে রাখত শ্রোতামণ্ডলীকে। ইংরেজিতে তাঁর সাবলীল বিচরণ ছিল। ফরাসি ও স্প্যানিশ সাহিত্যের বিস্তর খোঁজখবর রাখতেন তিনি। বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্যচিত্র সম্পাদনায় তাঁর পরামর্শ ও কখনো কখনো প্রয়োজনে লেখার সহযোগিতা নিতে হয়েছে। তিনি নিজেও এগিয়ে এসেছেন স্বউদ্যোগে।

আধুনিক গানের মহলে সৈয়দ হক অতি আদৃত এক সংগীত লেখকের নাম। ১৯৬০ সালে বাংলা ছায়াছবি *সুতরাং*- এর বিপুল সাফল্যের পেছনে ছিল সুরকার সত্য সাহার সুরারোপিত গানে। শিল্পী আনজুমান আরা ও (বর্তমানে লেখক ও প্রকাশক) কাজি আনোয়ার হোসেনের কণ্ঠে দ্বৈত সংগীত– 'তুমি আসবে বলে ভালোবাসবে বলে ওগো শুধু মোরে' তাঁকে বিপুল পরিচিতি দান করে। এর আগেই তিনি শুধু গান নয় ছায়াছবি পরিচালনাতেও যুক্ত হন। ১৯৫০ দশকের শেষদিকে *মাটির পাহাড়* ছবিতে সহকারী পরিচালকও হন। সেসময় প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও পরে ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত কাফি খান ছিলেন ছবির নায়ক। মাটির পাহাড়ের গান, চিত্রনাট্য লেখা এক কথায় পুরো ছবির প্রধান সব কাজ করেছেন কার্যত একা সৈয়দ হক। সৈয়দ হক কর্মজীবন, লেখা, চাকরি ও সাহিত্য জগৎ সব জায়গায় ছিলেন নিয়মিত। তাঁর কঠোর পরিশ্রমের বিষয়গুলো অনেকটা অজ্ঞাতই থেকে গেল। উর্দু ও হিন্দি তিনি বেশ ভালো জানতেন। ছিলেন নিয়মিত সিনেমা দর্শক। মঞ্চ কাঁপানো কাব্যনাটক *নূরুল দীনের সারাজীবন*, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*– সৈয়দ হকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকর্মের স্বাক্ষর।

সৈয়দ হক সব্যসাচী নামে সর্বাধিক পরিচিত। জীবনের শেষ কটি বছর মিডিয়ার সামনেই থাকেন। তবুও প্রথম জীবনের অনেক কথা

বাকি রয়ে গেছে। সহধর্মিণী পেশায় চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হকের সঙ্গে তার পরিচিতি, ঘনিষ্ঠতা, বিয়ে ও বিয়ে- পরবর্তী টানা সুখী দাম্পত্য জীবনে এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সফল তিনি।

একমাত্র কন্যা লন্ডনে ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষকতা করছেন– এটা তাঁকে বেশ তৃপ্ত করে তুলত। যে কথা বিটিভি'র সাক্ষাৎকারে সহাস্যে শ্রোতাদের জানিয়েছিলেন তিনি। '৫০-এর দীপ্ত তরুণ বলে পরিচিত সৈয়দ হক, ফজলে লোহানী, (চিত্র পরিচালক) খান আতাউর রহমান (চিত্রশিল্পী) মর্তুজা বশীর যে যার মতো সময়ে ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন। তাঁরা ভিন্ন সংস্কৃতিতে যোগ্যতরভাবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছিলেন যা আমাদের সংস্কৃতিতে এখনো বহমান। এই আত্মপ্রত্যয় পরবর্তীকালে তরুণদের মাঝে অনুপ্রেরণা যোগায়।

সাহিত্য জীবনেও সতীর্থ, বন্ধু, শ্রদ্ধেয় সব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কখনো যৌথভাবে কখনো একা উত্তরাধিকার হয়ে সৈয়দ হক এসেছেন।

স্মৃতিচারণে কবি শামসুর রাহমানের প্রসঙ্গ আসত স্বভাবতই। সাংবাদিক শাহিন রেজা নূরকে তিনি বলেছেন, 'শামসুর রাহমান একটি কথা দুষ্টুমি করে বলত– 'কে যে হাতছানি দিল আর পথে বেরিয়ে পড়লাম আর তো ফিরতে পারলাম না।' আমি এ কথার পুনরাবৃত্তি করে ওর হাত ধরে বলতাম, আপনি তো ঘাসের তলায় মাটির সঙ্গে সখ্য করে আছেন আর আমি এখনো পথে'। ৮০তম জন্মদিনে একটি বাংলা পত্রিকাকে বলেছেন, 'আমার একটা পরম সৌভাগ্য আমার সেইসব মহান অগ্রজের অকৃপণ সৌহার্দ্য পেয়েছি... জসীম উদদ্দীন, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শওকত ওসমান, ফররুখ আহমদ, কত কত জন'।

অতৃপ্তি ছিল সব সৃজনশীল মানুষের মতো তাঁরও। বহুদিন আগে জাতীয় প্রেস ক্লাব ও জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সাহিত্য বিষয়ক এক কর্মশালায় তিনি কবিতা প্রসঙ্গে ছিলেন একমাত্র আলোচক। সৈয়দ হক বলেন, 'আমি আমার কবিতার সমালোচনা শুনলাম না। শুনতে চাই। প্রশংসা বিস্তর পেয়েছি। নিন্দাও জুটেছে। কিন্তু সেই আয়নাটি দেখিনি যেখানে আমাকে সঠিক অবস্থানে দেখানো হয়েছে।'

সৈয়দ হক অসুস্থ থাকা অবস্থায় ফেইসবুকে কবি কে জি মোস্তফা ও খ্যাতিমান সংগীত রচয়িতার সঙ্গে সৈয়দ হকের একটি অনুষ্ঠানের যৌথ ছবি অসংখ্য লাইক পেয়েছে।

ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ে এ বছর। সৈয়দ হক চিকিৎসার জন্য এপ্রিল মাসে লন্ডনে যান। যেখানে রয়্যাল মার্সেডন হাসপাতালে তাঁর শরীরে ৬টি কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসায় ক্যান্সার পুরো বিলোপ না হওয়ায় ১ সেপ্টেম্বর সৈয়দ হক দেশে ফেরার পর ৩ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর শরীরে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬টি কেমোথেরাপি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন ইউনাইটেড হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসপাতালে সৈয়দ হককে দেখতে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার সিদ্ধান্তের কথা জানান।

৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে স্মরণ করেন এভাবে– 'স্বপ্নবান এবং দূরে দুটি চোখ, এমন একটি মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

তখন তিনি বলেন, 'আমাদের সময়ের কেউই প্রায় নেই। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আছে। শরীরটা ওর ভালো নয়। কিন্তু এখনো লিখছে। দূর লন্ডনে আছে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। আর একজনই আছেন আনিসুজ্জামান কত সভা–সমিতিতে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। আমাদের ভিতরে কাউকে যদি মনীষী বলি, তবে আমি তাঁকেই শুধু পাই।' একথা বলার এক বছর পার না হতেই তিনিও হয়ে গেলেন স্মৃতি–ইতিহাস।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও সৈয়দ হকের সঙ্গে সাম্প্রতিক কাব্য আলোচনায় সৈয়দ হক ছিলেন দীপ্তিময়। বিহ্বল কণ্ঠে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, 'মশাল কি নিভে গেল বন্ধু/রোদ্দুর মুছে যাবে সন্ধ্যায়/ রক্ত কি মুছে যাবে বন্ধু/জীবনটা কেটে যাবে তন্দ্রায়? '(মশাল মিছিল : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী) জবাবে সৈয়দ হক অজেয় দৃঢ়তায় শোনান– 'এসেছি বাঙালি রাষ্ট্র ভাষার/লাল রাজপথ থেকে/এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু/শেখ মুজিবুর থেকে/ আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে/এসেছি আমার পেছনে হাজার/ চরণ চিহ্ন ফেলে/শুধাও আমাকে 'এত দূর তুমি/কোন প্রেরণায় এলে?/' (আমার পরিচয়: সৈয়দ শামসুল হক)। বিস্ময়কর ব্যাপার সৈয়দ হকের ক্রম উত্থানকাল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত আন্দোলন পর্বের ঊর্ধ্বযাত্রা প্রায় পাশাপাশি হাত ধরে হয়েছে। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিচল কণ্ঠে বলেন, নির্বাচন হয়েছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ।

ঢাকায় ফিরে আসার পর ইউনাইটেড হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে হাসতে হাসতে বলেন, '(সমকাল সম্পাদক) গোলাম সারোওয়ার চাপ দিয়ে লেখা আদায় করে নিত। ফলে গত কয়েক বছর ঈদে কেবল সমকালে আমার উপন্যাস প্রকাশিত হয়।'

লন্ডনে চিকিৎসার সব ধরনের চেষ্টাই করেছেন। সময় তাঁর ফুরিয়ে এসেছিল। কিন্তু নতি শিকার করেননি। দেশে ফিরে সাক্ষাৎ প্রার্থী কবি জুন্নু রাইনকে বলেন, 'রাজার মতোই এসেছি, রাজার মতোই যেতে চাই।'

মৃত্যু তাঁকে নশ্বর জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চিরঞ্জীব সৈয়দ হক বৈশাখি পঙ্‌ক্তিমালার মতো ছড়িয়ে থাকবেন বাংলা সাহিত্যে। জন-জীবনে বেঁচে থাকবেন তিনি।

## সৈয়দ হকের শেষ লেখা

আহা, আজ কী আনন্দ অপার
আহা, আজ কী আনন্দ অপার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
জয় জয় জয় জয় বাংলার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তাঁর
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
পঁচাত্তরের কলঙ্কিত সেই রাত্রির পর
নৌকা ডোবে নদীর জলে
সবাই বলে নৌকা তুলে ধর
কেইবা তোলে কে আসে আর
স্বপ্নবাহু তাঁর
বঙ্গবন্ধু কন্যার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
শেখ হাসিনার সব নদীতে
দুর্জয় গতিতে
টেনে তোলেন নৌকা আনেন উন্নয়ন জোয়ার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
জাতির পিতার রক্তে দেশ
এখনো যায় ভেসে
সেই রক্তের পরশ মেখে দেশ উঠেছে জেগে
এ দেশ তোমার আমার
জয় জয় জয় জয় বাংলার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তাঁর
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
আহা, আজ কী আনন্দ অপার!

*[প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে এই লেখাটি লিখেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক। অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল। কবির মৃত্যুতে জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়।]*

নিবন্ধ

# খাদ্য নিরাপত্তায় বিশ্বে মডেল বাংলাদেশ

**ইলিয়াছ হোসেন পাভেল**

ষোলো অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন) ২০তম সাধারণ সভায় হাঙ্গেরির তৎকালীন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. প্যাল রোমানি বিশ্বব্যাপী এ দিনটি বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮১ সাল থেকে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতিষ্ঠার দিনটিতে (১৬ অক্টোবর ১৯৪৫) দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

একটি দেশের নাগরিকের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য অন্যতম। তাই গত কয়েক দশকে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাষযোগ্য জমি সংরক্ষণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম বনায়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীর সবগুলো উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ, বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যস্ত হয়ে আছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়া পরিবর্তন এবং আরো কয়েকটি বিষয়ের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এখন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের একটি।

খাদ্য নিরাপত্তা বলতে খাদ্যের লভ্যতা এবং মানুষের খাদ্য ব্যবহারের অধিকারকে বোঝায়। কোনো বাসস্থানকে তখনই 'খাদ্য নিরাপদ' বলে মনে করা হয়, যখন এর বাসিন্দারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বসবাস করেন না কিংবা খাদ্যাভাবে উপবাসের কোনো আশঙ্কা করেন না। বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন (১৯৯৬) অনুযায়ী, 'খাদ্য নিরাপত্তা তখনই আছে বলে মনে করা হয় যখন সকল নাগরিকের সব সময়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা থাকে। যা তাদের সক্রিয় ও সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণের জন্য সঠিক পরিমাণ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে।

আমাদের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে 'খাদ্য' অন্যতম। কিন্তু 'খাদ্যে' সঙ্গে শুধু 'নিরাপত্তা' নয় 'নিশ্চিত' শব্দটি এখন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন এই নিরাপত্তাহীনতার একটি বড়ো কারণ। তবে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তায় অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আবাদযোগ্য কৃষিজমি ও খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া কৃষি খাতে বিপুলসংখ্যক মৌসুমি বেকার রয়েছে। তারপরও সরকার খাদ্য নিরাপত্তা দিতে সফল হয়েছে।

ইউএসএআইডি'র মিশন ডিরেক্টর রিচার্ড গ্রিন বলেছেন, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তায় প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি বলেন, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও তারা সফল।

*অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৬ অক্টোবর ২০১৬ ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে 'জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাদ্য এবং কৃষিও বদলাবে' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের উদ্‌বোধন করেন। এসময় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং খাদ্যমন্ত্রী মো. কামরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি*

একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। কৃষকের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই সরকার নন-ইউরিয়া সারের দাম কমিয়েছিল। বর্তমানে কৃষি–শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। ইউরিয়া সারের দাম কমানোর ফলে উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। অন্য এক বিশেষজ্ঞ বলেন, বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক খাদ্য শিল্প খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে এবং এতে বিশাল কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর ফুড সিকিউরিটি (আইওএফএস) মন্ত্রী পর্যায়ের কনফারেন্সে। কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত আইওএফএস বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের ৭ম কনফারেন্স এবং ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর ফুড সিকিউরিটির প্রথম সাধারণ অধিবেশনে এ প্রশংসা করা হয়।

দেশের মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা কত তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩ কোটি ৪২ লাখ ৬০ হাজার টন চাল ও ১০ লাখ ৩৯ হাজার টন গম উৎপাদন হয়। মোট খাদ্যশস্যের (চাল, গম) উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৫২ লাখ ৯৯ হাজার টন। বীজ ও অপচয় বাবদ ৩৫ লাখ ২৯ হাজার ৯শ টন বাদ দেওয়ার পর নিট খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা ছিল ৩ কোটি ১৭ লাখ ৬৯ হাজার ১০০ টন। ওই সময় দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যশস্যের চাহিদা সাড়ে ৫শ গ্রাম ধরা হয়। এ হিসাবে ১৫ কোটি লোকসংখ্যা ধরে বার্ষিক চাল, গমের চাহিদা ৩ কোটি ১ লাখ সাড়ে ১২ হাজার টন। সেখানে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত থ াকার কথা বলা হয়। এই খাদ্য উদ্বৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সামনে খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেশটির গণমাধ্যম *খালিজ টাইমস* জানিয়েছে, খুব শিগগিরই মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে সবচেয়ে বড়ো খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। *খালিজ টাইমস* কারণ হিসেবে বলেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১০ লাখ বাংলাদেশি বসবাস করে। তাদের কারণেই মূলত দেশটিতে বাংলাদেশি খাদ্যপণ্যের প্রচার পাচ্ছে। *খালিজ টাইমস* আরো জানায়, বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি রয়েছে। উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এসব কৃষিজমিতে বর্তমানে প্রতিবছর তিনটি শস্য উৎপাদন করছে দেশটি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রতিবছর ৩০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। পত্রিকাটির মতে, এরমধ্যে ৬০ শতাংশেরই বেশি খাদ্যপণ্য।

১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। কৃষিবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। ২০০০-০১ অর্থবছরে মোট খাদ্য উৎপাদন বেড়ে হয় দুই কোটি ৬৯ লাখ মে. টন। আওয়ামী লীগের মাত্র ৫ বছরে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৭৯ লাখ মে. টন। সার্বিক কৃষির ফসল খাতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ সালে যথাক্রমে ৮.১০ এবং ৬.১৮ হারে। কৃষি খাতের উন্নয়ন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) 'সেরেস' পদকে ভূষিত করে।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে পূর্ববর্তী সরকারের যেসব নীতিমালা দেশের অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক হয়, তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে– এটাই রীতি। ১৯৯৬-০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি খাতের সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, পরবর্তীতে বিএনপি সরকার সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। এতে ২০০১-২০০৬ মেয়াদেও বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ১৯৯১-১৯৯৬ মেয়াদের মতো সার, বীজ, ডিজেলসহ কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণে দুর্নীতি, লুটপাটের ব্যবস্থার কারণে কৃষি খাতকে করে তোলে সংকটাপন্ন। ২০০২ সাল থেকে প্রতিবছরই দেখা দেয় ডিজেল ও সারের সংকট। কৃষি উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার আবার কমে প্রায় শতকরা তিন দশমিক পাঁচ (৩.৫%) ভাগে দাঁড়ায়। কৃষি খাতে উৎপাদন ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বাজারে খাদ্যশস্যের অগ্নিমূল্যের কষাঘাতে সারাদেশের নিম্ন আয়ের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। অপরদিকে সরকারের খাদ্যগুদামে নিরাপদ মজুত গড়ে তোলাও সম্ভব হয় না। আর এই ধারা অব্যাহত থাকে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'বছরেও। দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিপর্যয়পূর্ণ পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী দেখা দেয় খাদ্য সংকট। ফলে ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সৃষ্টি হয় আরো জটিল ও ভয়াবহ অবস্থার।

আওয়ামী লীগ সরকার নতুন করে ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ২৫ মে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'। আইলার আঘাতে ওই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নতুন করে ঝুঁকির মুখে পড়ে। এর আগেই সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। এলক্ষ্যে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই ইউরিয়া ব্যতীত সকল প্রকার সারের মূল্য অর্ধেকে কমিয়ে আনা, ভালো বীজ সহজলভ্য করা, ডিজেলের মূল্যে কৃষককে ভরতুকি দেওয়া, ব্যাংক ঋণ সহজ করাসহ কৃষিতে ভরতুকি বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়। এতে কৃষকরা ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হয়। ফলে পরবর্তী সব মৌসুমে

প্রধান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সরকার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দিকেও লক্ষ রাখছে। আর এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েই নিরাপদ খাদ্য মজুত গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছে।

সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুলভমূল্যে খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকায় চাল দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। একটি হতদরিদ্র পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল পাবে। ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রামের চিলমারীতে এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। এ সহযোগিতা পাওয়া যাবে বছরের মার্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি কমিটি থাকবে। সেখানে জনপ্রতিনিধিরাও রয়েছেন। তারাই হতদরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ঠিক করে তাদের কার্ড দেবেন। নীতিমালা অনুযায়ী তাদের চাল দেওয়া হবে।

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (PFDS) আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিরাপদ মজুত গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। এজন্য সরকার দুটি উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে থাকে। প্রথমত, দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সংগ্রহ করে। দ্বিতীয়ত, বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে এ মজুত গড়ে তোলা হয়। দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে যে-কোনো সময় বাংলাদেশের খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা ছিল প্রায় ১৫ লাখ টন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিরিখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ পরিমাণ মজুত মোটেই যথেষ্ট নয়। এ পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এজন্য বিদ্যমান গুদাম সংস্কার ও নতুন গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে গুদামের ধারণ ক্ষমতা ৩০ লাখ টনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

খাদ্য স্বনির্ভরতা অর্জনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে একটি মডেল। চাষযোগ্য ভূমিতে বিশাল জনসংখ্যার চাপ সত্ত্বেও কৃষি ক্ষেত্রে দেশটি ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি খাদ্যপণ্যের মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাবার, হিমায়িত মাছ, চিংড়ি, সবুজ শাকসবজির ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাই দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিতে গবেষণা ব্যয় বৃদ্ধি ও কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। কৃষি গবেষণায় বাজেট অবশ্যই বাড়াতে হবে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্থাৎ বেশি বেশি উৎপাদন শুধু নয়, উৎপাদিত শস্য-ফসল সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, আমাদের ভাতের সঙ্গে সঙ্গে গম, আলু, শিম, ভুট্টাসহ অন্যান্য খাবার খাওয়ার অভ্যাস করা, মাঠ পর্যায়ে সারের সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি কৃষি কাজে সবাইকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়ে কাজ করতে হবে।

**তথ্যসূত্র :**


১. বৃহৎ খাদ্য রপ্তানিকারক হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, ফারজানা ফারিজ (২৩ আগস্ট, ২০১৬)

২. খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা (২৯ এপ্রিল, ২০১৬)

৩. বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, অর্জিত সাফল্য টেকসই করতে হবে
ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক (৩ জানুয়ারি, ২০১২, জনকণ্ঠ)

৪. খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ (৭ মার্চ, ২০১৩)

৫. বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও কিছু প্রতিবন্ধকতা, আব্দুস সালাম সাগর (২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০, ডেসটিনি)

৬. Food security and Bangladesh, Goutam Gourab Barua (24 October, 2012, Financial Express)

৭. Food reserve diclines by 250,000 tonnes, Abu Bakar Siddique (13 July, 2013, Dhaka Tribune).

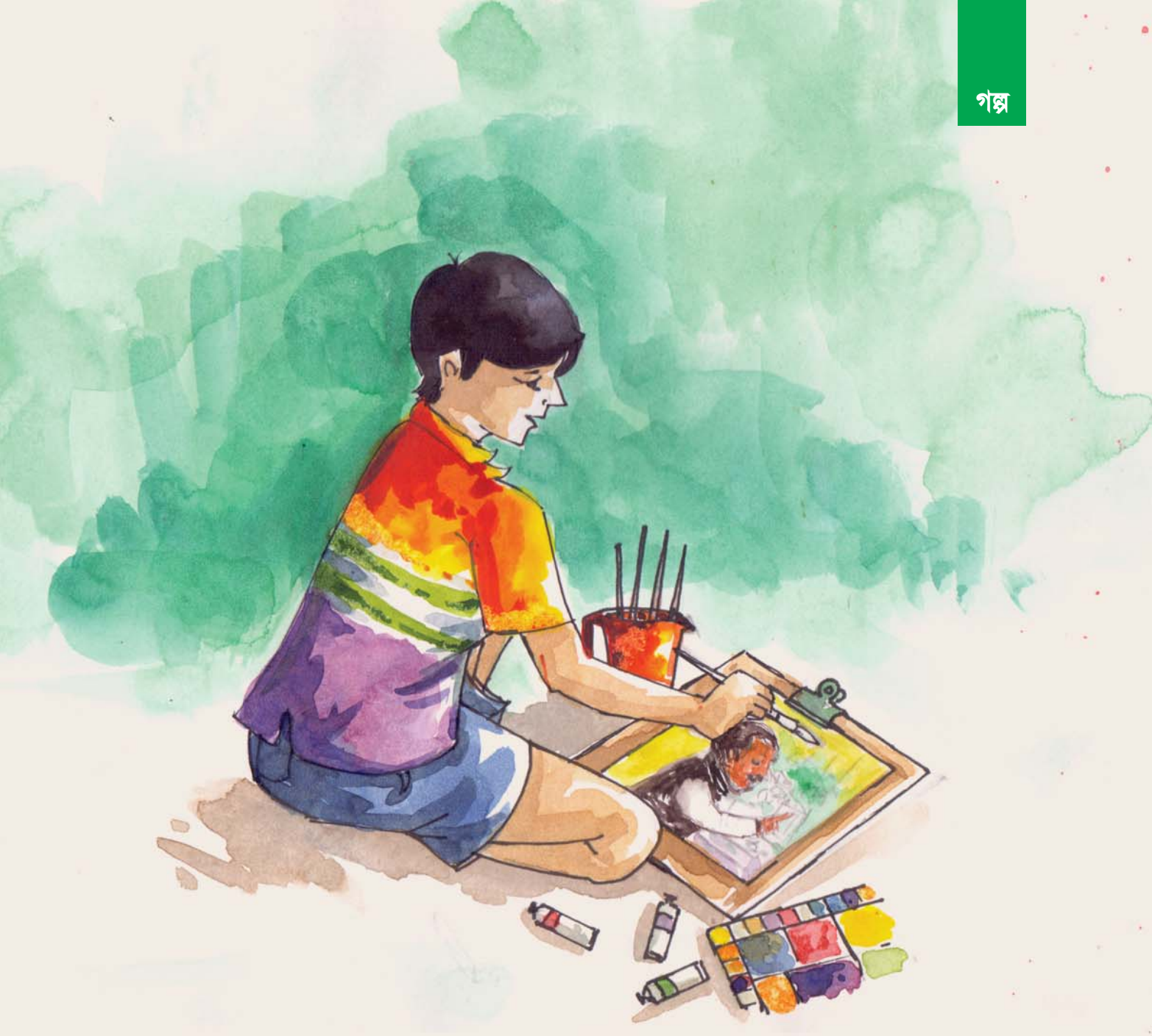

# জন্মদিনের ছবি

**রফিকুর রশীদ**

তখনও সকাল হয়নি।

পুবের আকাশে আলো ফোটেনি। তবে রাতের আঁধার ফিকে হয়ে এসেছে। ভোরের পাখিদের সবে ঘুম ভেঙেছে। তারা পাখা ঝাপটানিতে আঁধার তাড়াতে চায়। গলা উঁচু করে কেউ কেউ প্রভাতি ঘোষণাও দেয়। রাসেলের তখন ঘুম ভেঙে যায়।

অথচ এতটা ভোরে কখনোই ঘুম থেকে ওঠে না সে। স্বভাবটাই তার ঘুমকাতুরে। মর্নিং ইশকুলের সময় ভয়ানক বিপদে পড়তে হয়। উহ্, বিপদ বলে সে বিপদ! ঘুম থেকে ওঠা, হাত-মুখ ধোয়া, ড্রেস পালটানো, নাস্তা খাওয়া– কী যে ঝামেলা! অমন সাতসকালে নাস্তা খাওয়া যায়! কে শোনে কার কথা! খেতে তাকে হবেই। হাসু আপু এ বাড়িতে থাকলে তখন বেশ হয়। ভাগ্নে জয়ের পাশে গিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়তে পারলেই হলো। প্রথমে এক পশলা বকাঝকা হাসু আপুও করবে। কত রকম তার সাবধানতা– জয়ের গায়ে যেন ধাক্কা লাগে না, ওর ঘুম পাতলা, এখনই জেগে উঠবে কিন্তু! রাসেল মনে মনে হাসে। ভাগ্নে তার ঢের সেয়ানা হয়ে গেছে। ছোটো মামার গায়ের গন্ধ পেলেই ঘুম ছুটে যায় তেপান্তরে। তখন পরম আনন্দে ডান হাতটা তুলে দেয় ছোটো মামার গলার ওপরে।

চোখে চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে দেয়। মুখে যতই সাবধান করুক, হাসু আপু যেন বা মামা-ভাগ্নের দুষ্টামির দৃশ্য দেখেও না দেখার ভান করে, কপালের ওপরে ডান হাতটা তুলে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে থাকে। মা এসে রাসেলের খোঁজ করলে তখন দিব্যি জানিয়ে দেয়– 'থাক না মা, জয়ের সঙ্গে ও খেলছে, খেলুক!'

'অমা, ওকে ইশকুলে যেতে হবে না? বেলা হয়ে যাচ্ছে যে!'

হাসু আপু তখন সোজাসুজি ছোটো ভাইয়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়,

'রাসেল আজ আর ইশকুলে যাবে না মা। আমার কাছেই থাক।'

খুশিতে হাসু আপুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে রাসেলের। ছোটোদের মনের কথা না বলতেই কী সুন্দর বুঝে যায়! খুব ভালো লাগে রাসেলের। কিন্তু ভাগ্নে জয়কে ডিঙিয়ে হাসু আপুর কাছে সে যাবে কী করে! ঘরের দরজা থেকে মায়ের চলে যাবার শব্দ শুনে মন ভরে যায় রাসেলের। তখন সে জয়ের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় হাসু আপুর কানের লতি পর্যন্ত। আস্তে করে ছুঁয়ে দেয় বড়ো বোনের কানের লতি। এটা ওর আদর প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গি। হাসু আপু সেটা খুব ভালোই জানে। তাই ছোটো ভাইয়ের ডান হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলে– 'খুব হয়েছে যা, অত আদর করতে হবে না।'

রাসেল কিছুতেই ভেবে পায় না– ঘুম ভাঙার পর আজ তার এসব স্মৃতি কেন মনে পড়ছে! জয় এতদিনে কত বড়ো হয়েছে? ছোটো মামাকে ওর কি মনে পড়ে? হাসু আপু জার্মানি চলে গেল যে! না হলে সে জয়কে ঠিকই সাইকেল চালানো শিখিয়ে দিত। ওর বড়ো মামা, মেজ মামা তো কোনোদিন সময় দেয়নি ভাগ্নের জন্য। বাড়ির বাইরে তাদের কত কাজ। দিনের শেষে কখনো একবার ভাগ্নের গাল টিপে দিলেই হলো। ওইটুকু আদরে প্রাণ ভরে জয়ের! সে গুটিগুটি পায়ে সারাদিন ঘুর ঘুর করে ছোটো মামার পিছে পিছে। রাসেল মোটেই বিরক্ত হয় না তার উপরে। বয়সের ব্যবধান পাঁচ-ছয় বছরের হলেও ছোট্ট জয়ের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব, রাজ্যের খেলাধুলা, হরেক রকম খুনসুটি। সেসব কথা কি একটুও মনে পড়ে জয়ের? হারিয়ে যাওয়া ছোটো মামার জন্যে কখনো ওর মন খারাপ করে?

আজ কদিন ধরে রাসেল একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছে। শৈশব থেকেই তার ছবি আঁকার হাত ভালো। ইশকুলের ড্রয়িং টিচার এ কারণে বরাবরই তাকে বেশি বেশি আদর করতেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন– হবে, তোমাকে দিয়েই হবে।

বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ পরিহাস করত, কী হবে স্যার রাসেলের?

স্যার এমনই সহজ-সরল মানুষ, পরিহাসকে গায়েই মাখতেন না। রাসেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বলতেন– ফ্যামিলির সবাইকে রাজনীতি করতে হবে তার কোনো মানে আছে! রাসেল ছবি আঁকবে, গান গাইবে, খেলাধুলা করবে, ওর যে ক্রিয়েটিভ প্রতিভা...।

মনে মনে গজরায় রাসেল–ক্রিয়েটিভ না ছাই! আজ কদিন ধরে চেষ্টা করেও সে বাবার ছবি আঁকতে পারছে না। নিজের জন্মদাতা পিতা, তাকে কি সে কম কিছু চেনে! ভরাট মুখমণ্ডল, ঠোঁটের ওপরে কালো গোঁফ, চওড়া ডান্টি কালো ফ্রেমের চশমা, মাথায় ব্যাকব্রাশ চুল– সব তার চেনা। প্রিয় টোবাকো পাইপ হাতের মুঠোয় থাকলে কেমন লাগে আর ঠোঁটে গোঁজা থাকলে কেমন দেখায় সবই তার জানা। দেশের মানুষ তাঁকে জাতির পিতা বলে, বেশ তো বলুক, এতে তার পিতা তো হারিয়ে যাচ্ছে না; তাহলে সে পিতার ছবি আঁকতে পারবে না কেন! এই তো সে দিন গভীর মনোযোগ দিয়ে আঁকতে বসে এবং অতি দ্রুত পেন্সিল-স্কেচ এঁকেও ফেলে। ওই ছবির মধ্যে এমন এক সারল্যের ছাপ আছে, পেন্সিলে আঁকার সময় বিশেষ পরিশ্রমই হয় না, টান দিলেই রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে আদল। তারপর রঙের কাজ করতে গিয়েই যত ঝামেলা। হয়েও হয় না, ফুটেও যেন ফোটে না। রাসেল তবু হাল ছাড়ে না। একেবারে ফিনিশিং টাচ দিতে গিয়ে সহসা সে চমকে ওঠে– বাবার চোখে অশ্রুধারা! কে আঁকল এই অশ্রুধারা? কোত্থেকে এল এই লোনাজলের রেখা!

ছবি থেকে চোখ ফেরাতে পারে না রাসেল। ভেতরে ভেতরে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। ছবিটা যে তারই আঁকা ছবি, তা জেনেও সে ডুকরে ওঠে,

বাবা, তুমি কাঁদছ কেন?

ছবি নির্বিকার। তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

রাসেলের তবু মনের ভেতরে শঙ্কা হয়–হাসুবু'র কোনো বিপদ হয়নি তো। হাসু আপুকে গ্রামের মানুষের মতো করে হাসুবু বলাতে কী যে সুখ ছোটো আপুকে সেকথা কিছুতেই বোঝানো যাবে না। তাকে ছোটোবু বলে ডাকলে সে রাগ করে। ছোট্ট জয়বাবুর জন্যে খুব টান ছোটো আপুর। হবে না কেন, মুখে বোল ফুটতে না ফুটতেই যে খালা ডাকতে শুরু করেছে। বাপরে বাপ, মায়ের কোলে যে ছেলের কান্না থামে না, খালার কোলে গিয়ে দুবার ফোপানোর পরই সেই ছেলে চুপচাপ। ছোটো আপা এমনই ঠান্ডা স্বভাবের মানুষ, তার সামনে কেউ রাগ দেখাতেই পারে না। এক নিমিষে রাগ মাটি করে দেবে। সেই ছোটো আপুর কিছু হয়নি তো! আছে তো মোটে দুই বোন,

যে–কোনো সময় যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে। বাবা কি সেই রকম কিছু আশঙ্কা করছেন?

এরই মাঝে দেশে কত বড়ো বড়ো বিচারকাণ্ড হয়ে গেল। বিচারের পথ বন্ধ করার আইন যারা করেছিল তারা তো এই দেশেরই মানুষ। তাদের সামনেই তো বিচারের রায় হচ্ছে, ফাঁসি হচ্ছে! একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। বিপদ তো আসতেই পারে হাসিনা-রেহানা যে- কারো ওপরে। চারিদিকে কত রকম বোমাবাজি হচ্ছে। একটা কিছু অঘটন ঘটতে কতক্ষণ!

বহুদিন পর গত রাতে হঠাৎ বাবার কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠে রাসেল। হ্যাঁ সেই কণ্ঠই তো। না না, জনসভার সেই কড়কড়ে বজ্রকণ্ঠ মোটেই নয়। শ্রাবণের মেঘ ভারানত কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত হয়,

রাসেল!

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে রাসেলের। এই মধ্যরাতে এ কোন কণ্ঠ ভেসে আসছে! কোথায় তিনি! ছবির আড়াল থেকে নাম ধরে ডাকছেন কনিষ্ঠ পুত্রকে? কেন ডাকছেন, ছবি আঁকাই তো সারা হয়নি এখনো! কত কাজ এখনো বাকি। এরই মাঝে নাম ধরে ডাকলে আর মনোযোগ থাকে! যতদূর থেকেই ভেসে আসুক, ওই কণ্ঠ রাসেলের কাছে অচেনা হবে কী করে! হাতের তেলোয় চোখ মুছে সামনে তাকায়, কান খাড়া করে; আবার উচ্চারিত হয়,

এ তুই কার ছবি আঁকছিস রাসেল?

কেন বাবা, তোমার ছবি! ভয়ে ভয়ে জানায় রাসেল। সেই কণ্ঠ বলে;

আমার ছবি! সে তো অনেক হয়েছে। আবারো....

না না, আমি আঁকছি জাতির জনকের ছবি।

মৃদু হাসির শব্দ শোনা যায়। হাসি থামলে শোনা যায় উচ্চারণ,

তুই বরং তোর মায়ের ছবি আঁকিস দেখি!

মায়ের ছবি! ধীরে ধীরে রাসেলের যেন ভয় ভেঙে যায়।

হ্যাঁ। ওই মানুষটা না থাকলে তো আমি কিছুই হতে পারতাম না।

রাসেল সাহস করে বলে,

তবু আমি তোমার ছবিটাই আগে আঁকতে চাই বাবা।

আমার তো অনেক রকম ছবিই ছাপা হয়েছে, তুই আবার নতুন কী আঁকবি?

সে ছবি এখনো ছাপা হয়নি বাবা। আমিই প্রথম আঁকতে চাই।

সেটা আবার কী রকম ছবিরে বাপু।

খুব সাধারণ ছবি বাবা।

সেটাই আঁকবি তুই?

হ্যাঁ বাবা, এদেশের সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে তোমার যে ছবিটা আঁকা আছে, আমি সেই ছবিটা তুলে আনতে চাই রঙে–রেখায়।

ও এই কথা! তাহলে তো তোমাকে সাধারণের মধ্যে মিশে যেতে হবে!

বাবা, পঁচাত্তরের সেই কালরাতের পর তো আমরা সবাই সাধারণ হয়ে গেছি!

সে-ই ভালো। সাধারণের মধ্য থেকে উঠে আসাটাই জরুরি।

এরপর রাসেলের আঁকা ছবিটা সামান্য একটু দুলে ওঠে। ছবিতে হাত লাগিয়ে বাবার চোখের অশ্রুরেখা মুছিয়ে দিতে চায় রাসেল। কিন্তু বাবা কোথায়! বাবার পরিচিত কণ্ঠ আর শোনা যায় না। কোথাও কিছুতেই বাবার অস্তিত্বই আর টের পাওয়া যায় না।

রাসেল তখন কী করে! খুব অভিমান হয় নিজের ওপরে। হাতের তুলি ছুড়ে ফেলে দেয়। নাহ্, আর ছবি আঁকবে না সে। কার ছবি আঁকবে– বাবার? তাহলে বাবা এ রকম ফাঁকি দিল কেন! ছবির আড়াল থেকে এভাবে কথা বলে চলে যাবার মানে হয়! আঁকতে হয় তো মায়ের ছবিই আঁকবে সে। তার মা হচ্ছে দুনিয়ার সব চেয়ে ভালো মানুষ। খুব শক্ত একটা শব্দ শিখেছিল অনেক আগে। মায়ের আগে সেই শব্দটা বেশ অবলীলায় লাগিয়ে দেয়–সর্বংসহা।

মনে মনে কখন যেন সেই সর্বংসহা মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে রাসেল। সত্যি সত্যি মা নেই সামনে। ধরাছোঁয়ার নাগালের মধ্যে মা নেই। তবু মায়ের গায়ের গন্ধ পায়, মায়ের আঁচলের ছায়া অনুভব করে। বটপাকুড়ের শীতল ছায়ায় তন্দ্রা নেমে আসে চোখে। রাসেল তখন কী করে! নিদ্রায় আর স্বপ্নে মাখামাখি করে নেমে আসে তার দুচোখের গভীরে। কী আশ্চর্য, হাসুবু এসে মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটে, ছোটো আপু গাল টিপে আদর করে, এমনকি ভাগ্নে জয় পর্যন্ত কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে ছোটো মামার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং দুষ্টুমি করে ডেকে ওঠে– 'মামু'!

ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে যায় রাসেলের। সাধারণত এত সকালে তো জেগে ওঠে না সে! জানালার বাইরে তাকিয়ে সে টের পায়– আঁধারের পর্দা ছিঁড়ে কেমন করে একটি সুন্দর সোনালি দিনের উন্মেষ ঘটে, রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে কেমন করে পাখির কলকাকলিতে ভরে ওঠে দিনের সূচনালগ্ন। হেমন্তের সকাল যে এমন স্নিগ্ধ সেকথা জানাই ছিল না রাসেলের। সহসা একটি দোয়েল ঠোঁটের ফাঁকে জন্মদিনের রঙিন কার্ড নিয়ে এসে জানালার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। সেই কার্ড হাতে নিয়ে রাসেল অবাক– এ যে হাসুবু'র হাতের লেখা! কার্ডের কোনায় লাগানো ডাকটিকেটে শেখ রাসেলের মুদ্রিত ছবির নিচে লেখা: '১৮ অক্টোবর শুভ জন্মদিন'।

## যদি কেউ আসে

**হাসান হাফিজ**

স্মৃতি যে তরল
ক্ষেত্র বিশেষে হয় হতে পারে
আততায়ী অবন্ধু তরল
তার কিছু হঠকারী ভুল–
যথেষ্টই, একেবারে নয় অপ্রতুল
তার দৌড় আমি ঠিকই জানি
ফিসফাস গুঞ্জরণ আধো কানাকানি
উপেক্ষা করার মতো ইচ্ছা ও সাহস
হারিয়ে ফেলেছি কবে অবহেলে
কেউ যদি দয়াপরবশ
সমর্পিতা হয়ে কাছে চুপিচুপি আসে
কাঙালের শর্তহীন তীব্র ভালোবাসে
আমি সেই অলৌকিক আলেয়ার আশে
মূর্খের মতন
দিগভ্রান্ত উচাটন করি পর্যটন
অস্থির আকুল হয়ে স্মৃতি হাতড়ে ফিরি–
অভিজ্ঞতা মোট কথা সুখকর নয়
এক শব্দে বলি তা বিচ্ছিরি!

## সক্রিয় নৈঃশব্দ্য

**শাহরিয়ার নূরী**

প্রতিদিন তাই হয় চলাফেরা অদলবদল
তন্ময় পৃথিবী জেগে ওঠে আলোর ছড়ায় নেয়ে
সূর্য উঠুক না উঠুক আঁধারের বিশ্রাম যেন
অজু শেষে তৃপ্ত মনে সদ্য ভোরে বসে পড়া

এত ঝকঝকে, চনমনে, ঝরঝরে কেন লাগে
দুনিয়াটা কী মহাজাগতিক দৌড়ে বিজয়ী!
নাকি জাফরান মেলা দেখে খুশি মনে হাসে পথে

পূর্ব আসমানে বর্ণিল ট্রাক স্যুট প্রাপ্তির আভা
কার চোখে! কোন খেলোয়াড়ের তৃপ্তির বিচ্ছুরণ!

গত সন্ধ্যায় ভারী মেঘ মাত্র বারো ঘন্টায়
ওজন কমিয়ে রোদেলা এক দীর্ঘাঙ্গী
তার প্রয়োজনীয় বক্ষের ভারে
এখন কে ভারসাম্য আনতে পারবে

নতুন দুনিয়া আবিষ্কারে ঘোর মত্ত থাকি রোজ
উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সূত্র ধরে মেতে উঠি বাগানে
তখন তুমি এলে হাসলে
বল্‌লে আমিই প্রকৃতির অনুসর্গ
ভুলে গেলে!

বন্য গন্ধে নিথর প্রকৃতি আর সরব আকুতি...
এর মাঝে সক্রিয় নৈঃশব্দ্যে ডুবে যেতে থাকি...

## পাহাড় পুরাণ

**রফিক হাসান**

কালের গন্ধে কালো পাহাড়, পুরাণ, সময় সিঁড়ি
নেমে গেছে ধাপে ধাপে, বিচ্ছুরিত আলো, সত্য থেকে
কলির অন্ধকারে, যুগযুগান্তের চেতনা, খাদে
খাদে আজও জমাট আঁধার, তবে কি ভুলে নেমে
আসা সতীর দক্ষিণ হাত? স্তব্ধ নিথর পাথরে
শুনি প্রলয় নৃত্যের গান, পাষাণ বিদীর্ণ করে
নামে স্বচ্ছ জলের ধারা, নগ্ন শরীরে জলকেলি
আদিবাসী নারী, ঘুঘু ডাকে, কাঁদে নির্জন দুপুর
চারদিকে সুনসান নীরবতা, নাকে লাগে দূর
পাহাড়ি ফুলের ঘ্রাণ, বাতাসে অরণ্যের সংগীত

পর্বত-প্রাচীর গাত্রে খুঁজে ফিরি কৈশোরের স্মৃতি
সেইসব সহযাত্রীরা কোথায় ? কোন পরপারে
এভাবেই থেমে যায় জীবনের সব কোলাহল
নিরুত্তাপ হাহাকার, কেবল ভারী হয় বাতাস।

## পদ্মাপাড়ের কিংবদন্তি

(১৬০০ সাল বঙ্গাব্দ)

**কনক চৌধুরী**

মুড়ি মুড়কি নাড়ু ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে মা বলেছিল
পথে দেরি হলে মনে করে খেয়ে নিস, খোকা
আর পৌঁছেই রায়েদের আড়তে ফোন করে খবর দিস
তোর বাবা বাড়ি ফেরার পথে খবরটা নিয়ে আসবে।

ছেলে বাড়ি থেকে পা বাড়াতেই মায়ের দুশ্চিন্তা শুরু
দূরের পথ, বিপজ্জনক পথঘাট তারপর আছে প্রমত্তা পদ্মা
মায়ের সব থেকে ভয় এই দুর্বোধ্য পদ্মাকে নিয়ে
কখনো শান্ত কখনো অশান্ত
কখনো সদয় আবার কখনো সর্বনাশা
এই পদ্মাকে পাড়ি দিয়ে যেতে হবে খোকাকে।

মা ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকায়
আকাশটা কি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে বা সহসাই উঠে ঝড়!

সেদিন গন্তব্যে পৌঁছাতে খোকার অনেক রাত হয়ে যায়
রায়েদের আড়ত সেই কখন বন্ধ হয়ে গেছে
মাকে আর ফোন করে পৌঁছানোর খবর দেওয়া হয় না
সারা রাত মা ছটফট করেছে নিশ্চয়ই।

তুমি কি পথিক! তুমি কি ঘোড়সওয়ার! তুমি কি পথযাত্রী!
তিলেক দাঁড়াও! শুনে যাও ১৪০০ সালের এ কিংবদন্তিখানি–
ছাড়িয়েছে ইতিহাস হারিয়েছে সময়
কত বসন্ত হয়েছে গত, কত বর্ষা হয়েছে সাড়া
কত গোলাপ ফুটেছে, বকুল ফুটেছে, ফুটেছে কৃষ্ণচূড়া
কত শুকিয়েছে মালা হয়ে, কত গেছে অনাদরে ঝরে
কিন্তু থেমে থাকেনি বাংলার পথ চলার জয়যাত্রা
তৈরি হয় বাংলার ঝাঁক নেওয়া পথে শতবর্ষ আগামীর স্বপ্ন পদ্মাপুল
যেন রূপসী বাংলার কণ্ঠে রুপার হার
এ যেন উত্তর-দক্ষিণকে সুতা দিয়ে সেলাই

যেন পূর্ব-পশ্চিম আকাশকে কাছে ডাকা

বাংলার ইতিহাসে এক টার্নিং পয়েন্ট
এ যেন প্রাশ্চাত্যের কাছে বঙ্গের আত্ম-মর্যাদা ঘোষণা

শতবর্ষ আগামীর আগাম স্বপ্ন দেখে এ বঙ্গবাসী।
একদিন বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে দেখিয়েছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন
তারপর তারই সুযোগ্য কন্যা পদ্মাপুল করে দিয়ে গেছে
শতবর্ষ আগামীর কল্পনাকে বাঙালির হাতের মুঠোয়।

হে পথিক! হে ঘোড়সওয়ার! হে পথযাত্রী!
এরই মাঝে শতবর্ষ হয়েছে গত–

## যে রাসেল আজ ষোলো কোটির প্রেমে

### পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

এই ছবিটি স্বপ্ন বোনার
এই ছবিটি  মুক্তা কণার
এই ছবিটি রাসেল সোনার।

এই ছবিটি বঙ্গবন্ধুর
এই ছবিটি বঙ্গমাতার
ছোট্ট ছেলে রাসেল সোনার।

এই ছবিটি শেখ হাসিনার
এই ছবিটি শেখ রেহানার
শেখ জামালের
শেখ কামালের
ছোট্ট ভাই সেই রাসেল সোনার।

এই রাসেলকে মারল কারা?
বুলেট গুলি ছুঁড়ল কারা?
তা সবারই জানা;
কিন্তু তাদের করতে বিচার
ছিল অনেক মানা।

ছোট্টমণি রাসেল সোনা
যার হাসিতে হীরের কণা ঝরে
তাকে ঘাতক মারল কেমন করে
চক্ষে লাগে ধাঁধাঁ।

ছোট্ট রাসেল শিকার যাদের
আজকে বিচার হচ্ছে তাদের
নেই যে কোনো বাঁধা।

ঝরঝরা করে রাসেল সোনার বুক
বাড়িয়েছে ঘাতকেরা বাংলার আমার
কোটি শিশুর দুখ্।
এক রাসেল আজ লক্ষ রাসেল হয়ে
জন্ম নিল দুখিনী মা সোনার বাংলার
দুঃখ নাশের জয়ে।

কাঁপতেছে তাই গুপ্ত ঘাতক
ছিল যারাই মস্ত পাতক

## রাসেল সোনার খোঁজে

### মো. মিজানুর রহমান মুন্সী

ঘুড্ডি নাটাই ফেলে
একটি কিশোর ছেলে
দূর আকাশে তাকিয়ে আছে উদাসী চোখ মেলে।

তার দুটি চোখ খুঁজছে যেন কী,
চুপিসারে কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছি–
জবাব দিল শুকনো নিথর ঠোঁটে
একটি শিশুর নাগাল পেতে দিন রাত্রি ছোটে।

জবাব শুনে বুকটা আমার কাঁপলো রে থরথর
রাসেল নামের শিশুর খোঁজে ঘর করেছে পর।
শহর, নগর, গঞ্জ খুঁজেছে মাঠের পরে মাঠ
খুঁজে-খুঁজে ক্লান্ত এখন পেরিয়ে তলস্লাট।
জিজ্ঞাসু তার ক্লান্ত দুটি চোখ
সিন্ধ আলোর পরশ মেখে তাকিয়ে অপলোক।

নরম সাদা মেঘের কাছে বলে,
কথায় কথায় চোখ দু'টো তার যায় হয়ে টলমলে
তারপরেও প্রশ্ন করেই চলে–
'তোমরা কি গো কেউ দেখেছ রাসেল সোনার মুখ
এই কথাটি জানতে আমি রয়েছি উন্মুখ।
কেমন ছিল মুখটি সোনার, কেমন ছিল হাসি,
তার দু'চোখে ছিল নাকি স্বপ্ন রাশি রাশি।
রাখতে যে চাই এসব স্মৃতি আমার অনুভবে
আঁকল ছবি রাসেল সোনার মিষ্টি অবয়বে'।

তোমরা চেন, কে এই রাসেল? কার আদরের ধন
যার খোঁজে এই কিশোর ছেলে উদাস সারাক্ষণ।
রাসেল হলো জাতির পিতার শেখ মুজিবের ছেলে–
দেশের মানুষ বাসতো ভালো সব মমতা ঢেলে।

## জাতির পিতা

### মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান

টুঙ্গিপাড়ার খোকা তুমি
জগৎ জোড়া নাম।
মানুষ ভালোবেসে তুমি
কুড়িয়ে ছিল সুনাম॥
জেল-জুলুম ও নির্যাতনে তুমি
কখনো করনি ভয়।
তোমার মনে আশা ছিল
হবেই বাংলার জয়॥
অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে
তুমি ছিলে সোচ্চার।
তোমার উপর করেছে কেস
পাকিস্তান সরকার॥
জীবনের তুমি অনেক সময়
কাটিয়েছিলে জেলে।
কখনো তুমি করনি হিসাব

বিনিময়ে কী পেলে॥
মায়ের ভাষার দাবিতে তুমি
থেকেছ রাজপথে
আন্দোলন সব ছড়িয়েছে তাই
বাংলার পথে পথে॥
পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে তুমি
দিলে ছয় দফা।
জান্তা সরকার করতে পারেনি
সেগুলোর কোনো রফা॥
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তোমাকে
করেছিল রাষ্ট্রদ্রোহী।
মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানুষ
হয়েছিল বিদ্রোহী॥

## স্বাধীনতা তুমি

**আরেফিন রব**

স্বাধীনতা তুমি ভোরের আলোর মতো শুভ্র
আমার প্রিয়ার হাসির মতো উজ্জ্বল।
কৃষকের কাস্তের ফলায় আগামীর হাসি
ভর দুপুরে ধরে ফেরার আকুলতা।
স্বাধীনতা তুমি আমার মায়ের ভালোবাসার মতো অকৃত্রিম
পিতার নির্ভরতার মতো শীতল ছায়া।
স্বাধীনতা তুমি উজ্জ্বল সূর্যের মতো প্রখর
আমার খোকার মতো চঞ্চল।
স্বাধীনতা তুমি ধানের শীষে দোয়েলের গান
নির্জন রাতে, তারাদের সাথে জোনাকির খেলা।
স্বাধীনতা তুমি অজানা আবেগে আপ্লুত....
এক বৈচিত্র্যময় সুখ
ভোরের ভেজা ঘাসের আগায় দেখি তোমার মুখ।

## শব্দ গ্রহণ

**মিলি হক**

পিপসা নদী, ব্রিজ পেরিয়ে পাড়
সোজা চলে গেছে পথ।
তার ডান মোড় ঘুরে বাড়ি
নীল পাটাতনের ঘর।

খেজুর গাছ, বাঁশের সাঁকো সামনে খোলা উঠোন
ধঞ্চে গাছের ফাঁকে আদিগন্ত ধানের মাঠ
জোয়ার চিংড়ি পোনা আসে।

উলটো দিকে পুকুর, পূর্ণিমায় জোড়া চাঁদ ভাসে
বাড়ির চারপাশে রয় না আর বাবলা গাছ
বাঁশ বাগানে হলদে পাখি
আমার বাড়ি। এখন তার কিছুই নেই।

সদর দ্বার আধেক খোলা
কেউ কি আছে?
শতাব্দী ফুরিয়ে গেছে ক্রমে
আমার বাড়ি এখন তার কিছুই নেই।
তাহলে আর ভিতরে কেন যাওয়া?
এখন এই একা একা বাতাসে
শব্দটুকু শুধু, পাওয়ার মতো পাওয়া।

## প্রেমের রকমফের

**মো. নুরুল ইসলাম**

স্বদেশের তরে থাকিলে প্রেম দেশপ্রেম তারে বলে
মানবপ্রেম হয় নিশ্চয় মানবকুলেরে ভালোবাসলে,
গরিব দুঃখী জনে প্রেম বরিষণে নাম হয় দীনবন্ধু
শরৎশশী উজ্জ্বলতা প্রেমে আখ্যা পায় শরবিন্দু।
ভাবনা প্রেমে মজিলে লোকে বলে তাকে ভাবুক
লজ্জাতে যার প্রেম বেশি তারই নাম হয় লাজুক,
ভোজনে প্রেমের হেতু কালান্তরে ভোজনবিলাসী
জ্ঞানের প্রতি প্রেম থেকে মানুষ হয় জ্ঞান-পিয়াসী।
সঁপিল প্রেম ভোগে পার্থিব জীবনে ভোগবিলাসী
ত্যাজি গৃহ মজিলে অনন্য প্রেমে হয় যে বনবাসী,
পর্বত আরোহণ প্রেমে খ্যাতি হয় পর্বত আরোহী
যার হয় প্রীতি বিরহে মানব সমাজে সেই বিরহী।
বিজ্ঞানে যদি থাকে প্রেম কারো হবে সে বিজ্ঞানী
সমরবিদ্যায় প্রেমের কারণে হতে পারে সেনানী,
শক্তি সাহসিকতা প্রেম থেকে কালক্রমে হয় বীর
দান-খয়রাতে প্রেম ঘটায় খ্যাতি ভালে দানবীর।
যৌন কামনা বাসনায় মজিয়াই হয় ভবে কামুক
মিথ্যাচার প্রেমেতে বানিয়ে দেয় মানবেরে মিথ্যুক,
নৌযান পরিচালনা প্রেমে মাতিয়া বনে যে নাবিক
ধর্মের সনে করিলে প্রেম সেজন হয়ে যায় ধার্মিক।
ঘটিলে প্রেম প্রিয়তমা সনে তাকেই বলে প্রেমিক
সুজনে বলে শিরি-ফরহাদ সম সে প্রেম অমায়িক,
প্রবঞ্চনায় ভণ্ড প্রেমিক কহে তায় সবে ধিক! ধিক!
অনিন্দ্য প্রেমে মন বিনিময় তথা আকর্ষ প্রাণাধিক।

# ভ্রষ্ট বিলাস

**সাগরিকা নাসরিন**

ভাগ্য প্রসন্ন বলে সদানন্দকে মিলল। হাসপাতালের ঝাড়ুদার। তার বউটিও ঝাড়ুদার। তবে তার চাকরি স্থায়ী নয়। বউ-এর চাকরি স্থায়ী করতে সদানন্দের সদা বিষাদ অবস্থা। এখন তার সদা আবাসস্থল ডাক্তারদের হাত-পা। কোনো ডাক্তারের হাত-পায়ের গড়ন কেমন, সম্ভবত চোখ বুজে সে বলে দিতে পারবে। কিন্তু এত ধরপাকড় করেও বউটার চাকরি স্থায়ী হচ্ছে না।

পারুলকে দেখে মনের কথা বলতে এসে ফেঁসে গেল সদানন্দ। কী দেখে পারুলকে তার আপন আপন লেগেছিল, সেই জানে। পারুল কেবল জিজ্ঞেস করেছিল, আইজকে আপনের এত মেজাজ খারাপ ক্যান?

-বইন, পরানডা যে কেমন করতাছে...

-হইছে কী কন।

-হাসপাতালের মর্গে গেছিলাম আউজ ডিউটি করতে। লাশগুলান কেমন কইরা যে ফালাইয়া রাখছে। দেখলে কান্দন আহে।

-আহারে....কার কপালের যে কী পরিণতি!

-আরো হুনবেন...? একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটরে দেইখা এক শয়তান ডোম যেভাবে লাশেরে উদলা কইরা দেখাইল। হুদাই। কেউ তারে দেখাইতে কয় নাই। হাসতে হাসতে মজা কইরা কারণ ছাড়া লাশের লগে এইসব মস্করা করল। লজ্জায় ঐ ম্যাজিস্ট্রেট

চোখ বন্ধ কইরা চইলা গেল। হেরপর একজন আবার লাশগুলার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সেলফি তুলল। তাও আবার হাইসা হাইসা।

-লাশ দেখলে কারো হাসি আসে!

-এই আহাম্মক জাতির হাসি আসে বইন।

-এরা আসলে মানুষ না। এই জাতিটা এত অমানুষ হইয়া গেল কেমনে। আপনের কথা শুইনাই আমার খারাপ লাগতাছে। তয় শোনেন সবাই কিন্তু খারাপ– আহাম্মক না। বিবেকবানও আছে। আপনের মতো।

পারুলের কথায় মায়া আছে। অসুস্থ মানুষটার পাশে না দাঁড়িয়ে পারা যায় না। ডাক্তারদের হাত-পা ধরে এমনিতেই অভ্যস্থ সদানন্দ। পারুলের জন্য না হয় আরো দু-চারজন ডাক্তারের পা ধরতে হবে। এ আর এমন কী! সদানন্দ সব কাজ আনন্দ নিয়ে করে। নামের সার্থকতা আছে। তার বাবা ছিলেন বেজায় রাশভারী লোক। মা চঞ্চলা দেবী। না খেয়ে থাকতে রাজি হলেও কথা ছাড়া বাঁচতে পারতেন না। বিপরীত চরিত্রের স্বামী থাকাতে বেশ কষ্ট ছিল তার। কথা বলে শান্তি পাননি জীবনে। ঘরসংসার করেও না। তাই মুখে কথা ফুটতে না ফুটতেই ছেলের সাথে কথা বলা শুরু চঞ্চলা দেবীর। মনের আনন্দ ছাড়া নাকি কথা আসে না মুখে। তাই ছেলের নাম রাখলেন সদানন্দ। মায়ের মৃত্যুর পরেও ছেলেকে কাঁদতে বারণ করে গিয়েছিলেন তিনি।

সদানন্দ নিজে কাঁদে না। অন্যের কান্না সহ্যও হয় না তার। পারুলের কষ্ট তাকে পাগল করে তুলল। জয়নব আর বকুলের বকবকানি পিছু হাঁটা তিষ্ঠোতে দিল না সদানন্দকে। অচিরেই অপারেশনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মানুষটা জাতে ছোটো। মনের বৃহদায়তনে বাদশা।

মোটামুটি সুস্থ হয়ে মাসখানেকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে হাসপাতাল ছাড়ল পারুল। কিন্তু তার পিছু ছাড়ল না মনাই।

আয়-রোজগারের আগেই যারা বিয়ের আয়োজন খোঁজে, মনাই তাদের দলভুক্ত না। এদের চেয়ে তার অবস্থান কিঞ্চিৎ ভালো। মাত্র সে রোজগারে হাত দিয়েছে। গ্রামের ক্ষেতের সরু আলের মতো কেবল গোঁফ গজিয়েছে তার। পেশায় রং মিস্ত্রি মনাই এখন বিবাহিত হওয়ার নেশায় মগ্ন।

মনাইয়ের সাথে পারুলের পরিচয় হাসপাতালেই। অসুস্থ বাপকে ভর্তি করিয়েছিল সে। সাথে ছিল বোন ময়না। ময়নার কোলে জান্নাত। বয়স দেড় বছর। চেহারাটা ফোলা ফোলা। ঝাঁকড়া চুলের জান্নাত যেন জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে আগত লোভনীয় মেওয়া। জয়নবের কী দোষ! জান্নাতকে আদর না করে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কার! তাই বলে এর জন্যে মনাই আপদ ঘাড়ে উঠবে। বাসায় ফেরার পর থেকে জ্বালিয়ে যাচ্ছে মনাই। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বাসার আশপাশ দিয়ে হাঁটতে পারে না জয়নব।

নিজের ডেরা ছেড়ে বকুল উঠে এসেছে বোন-বোনঝির সাথে। কিন্তু দুবোন মিলে মনাইকে দমনের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। রাতে যখন ঘরের বেড়া বা চালের ওপর ঢিল এসে পড়ে। দরজার বেড়াতে টোকা পরে, রক্ত শীতল হয়ে যায় তখন।

মনাই নাছোড় বান্দা। জয়নবকে বিয়ে সে করবেই। দেখতে সে খারাপ নয়। রোজগারপাতি আছে। কোন বিবেচনায় সে অযোগ্য? আর সারাদেশে যে বাল্যবিবাহ হচ্ছে না, তাতো না। ক্লাস সেভেনে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছে বুড়ো ইউপি চেয়ারম্যান। মনাইয়ের বেলায় বাঁধা কেন?

পারুলের নাগাল পায় না মনাই। তার যত আবদার ঝামেলা সব যায় বকুলের ওপর দিয়ে। আর যাই হোক হবু শাশুড়িকে উত্যক্ত করার মানুষ সে না।

জিয়ারত মিয়া নিখোঁজ হওয়ায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ বকুল। বোনের সংসার পুরোটাই এখন তার কাঁধে। ধার করা টাকায় হাসপাতালের ছাড়পত্র আনতে হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পারুলের ব্যবসা বন্ধ। ওদিকে মনাইয়ের উৎপাত বাপ হারা মেয়েদের বিরক্ত করা খুব সহজ। আলাদা একটা জোর পাওয়া যায়। মনাই দিন দিন সাহসী হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যে বকুলকে সে হুমকি দিয়ে ফেলেছে।

-নিজের মেয়ে হইলেতো এমন পাত্র হাতছাড়া করতেন না। বইনের মাইয়া বইলা এত হিংসা!

দুপুরের ঝাঁঝালো রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল বকুল। মাথার তালু জ্বালা করা রাগ গিলে ফেলে সে কেবল বলেছে, ওর বয়সতো মাত্র তেরো বছর।

-তেরো বছরের মেয়েদের কি বাচ্চা হয় না? বিশ্বে পাঁচ বছরের মেয়েরও বাচ্চা পয়দা করার রেকর্ড আছে। আপনে কি মনে করেন, আমি দিন-দুনিয়ার কোনো খবর রাখি না? ভাগ্নি বিয়া দেন, দেখবেন বছরে দুইডা বাচ্চা জন্মাইয়া ছাইড়া দেব।

-এইসব কী বলতেছ...?

-ঠিকই বলতেছি, অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আঠারো বছর হইতে অহনো অনেক দেরি। ততদিন আমি আঙুল চুষব?

-অন্য মাইয়া নাই দ্যাশে?

-দয়া কইরা কোনো পরামর্শ দেবেন না। ভাগ্নিরে দেবেন কি-না কন?

-আমিতো তার গার্জেন না।

-গার্জেন হইবেন।

আর কথা বাড়ায়নি বকুল। বুক ভরা ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছে। এভাবে কতদিন চলবে কে জানে। কেউ নেই কোথাও। মাথার উপরের বিশাল আকাশটাকে আরো বিশাল লাগে। পায়ের নিচে এক চিমটি মাটির অস্তিত্বও মেলে না। আধশোয়া বোনের দিকে তাকিয়ে বুকটা হা হা করে উঠে।

রাতে শোয়ার পরে কত যে অসহায়ত্ব এসে হামলে পরে চোখের ওপর। কেবল ঘুম পরি সহজে আসতে চায় না। কখনো দুবোনে মিলে কথা বলে বলে রাত ভারি করে ফেলে।

সেগুলো সব যে দুঃখের তা নয়। আনন্দের গল্পও আছে। বর্ষায় সাঁকো পার হয়ে মামাবাড়ি যাবার গল্প। কী নড়বড়ে সাঁকো। মাঝ বরাবর এসে কতবার যে নৃত্য করতে হয়েছে। পর-পর মরমর অবস্থা। একবার পারুলতো পড়ে গিয়েছিল ময়নালের একেবারে গায়ের ওপর।

সে কী লজ্জা! ছোটো বোনের স্বামী বলে কথা। তখনো বিয়ে হয়নি পারুলের। পছন্দের কারণে বকুলের সাথে ময়নালের বিয়েটা আগে হওয়াতে অনেকটা লুকিয়েই থাকত পারুল। ভুলেও ময়নালের সামনে পড়ত না।

সময় কত দ্রুত চলে যায়। সন্তান না হওয়ার অজুহাত পেয়ে যায় ময়নাল। মুহূর্তেই বকুলের প্রতি তার সকল প্রেম কর্পুরের মতো উবে যায়। বহুবার বিয়ে করেছে ময়নাল। সন্তানের মুখ সে দেখতে পায়নি। আজো জানে না বকুল, তার কী অপরাধ ছিল। শুরু হতে

না হতেই, জীবন কেন শেষ হয়ে গেল। একবার পথ হারালে কী নদী আর সমুদ্রের দেখা পায়। হায় একটি জীবন! কত সহজে মৃত্যু মেনে নেয়!

বকুলকে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই পারুলের। জীবন একটাই। দ্বিতীয়বার জীবন কী শুরু করা যায় না? বকুলের একটাই জবাব। -সাইধ্যা আর কষ্ট বাড়াবো না।

পারুলের কোনো জবাব নেই। জিয়ারত মিয়া নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে জীবনের প্রতি সেও মায়া হারিয়েছে। এখন চিন্তা কেবল জয়নবকে ঘিরে।

মনাই ছেলেটার ভাবগতি কালবৈশাখির মতো। হঠাৎ কোত্থেকে ধেয়ে এসে সবকিছু তছনছ করে দিতে পারার প্রবল ক্ষমতা নিয়ে তার জন্ম। একেবারে যেন ময়নাল। এত প্রতারণার পরেও মাঝে মাঝে ময়নালের জন্য ভিতরটা পোড়ে বকুলের। কী আজব মানুষ! ভালোবাসা দেখানোর বেলায় যেমন সেরা। নিষ্ঠুরতায়ও সর্বোচ্চে! চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে দেখল না। অমানুষের হৃদয় ধারণ করে কীভাবে মানুষ বেঁচে থাকে।

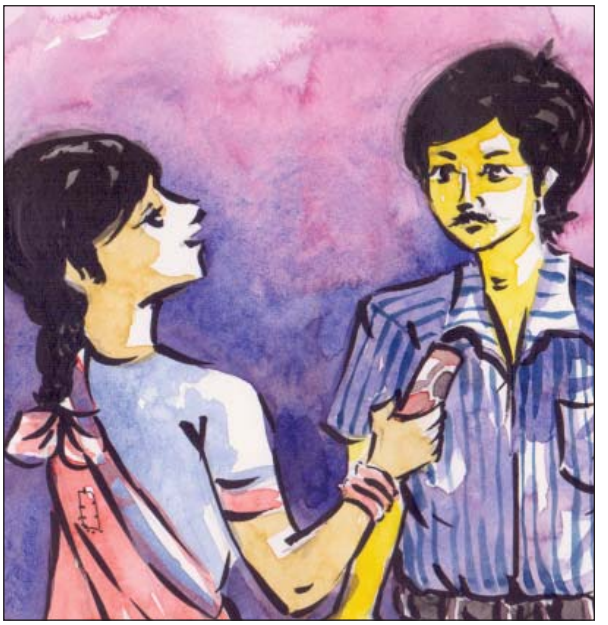

বকুলের বার বার মনে হয়, ময়নালের সাথে মনাইয়ের কোনো তফাত নেই। পাগলামি করতেও সময় লাগে না। মোহ ভাঙতেও সময় লাগে না।

এসব কতবার জয়নবকে বুঝিয়েছে বকুল। বরাবরের মতো আজো হেসে উত্তর দিয়েছে জয়নব, আমি কি ঐ পোলার লগে ভাইগা যাইতেছি?

-তুই ঠিক আছোস ঠিকই। তয় যেভাবে পিছে লাগছে।

-লাগুক। আমারে অত কাঁচা ভাইব না।

পরিপক্ক জবাব জয়নবের। অথচ এইতো সেদিন উদোম গায়ে পাড়াময় হেঁটে বেড়িয়েছে মেয়েটা। কোন যাদুর ছোঁয়ায় হঠাৎ বড়ো হয়ে গেল সে। নানা ভঙ্গিতে তার কথা বলা। কখনো শান্ত নদীর কুলকুল স্রোত। কখনো মেঘ গর্জনের হুঙ্কার, আবার কখনো খটখটে দুপুরের ক্লান্ত কোকিলের কুহু। এমনভাবে মানুষকে হঠাৎ বদলে দেয়, সে কোনো জাদুকর!

কাহনে কাহনে বয়সের এই যাদুকরি খেলায় অনেক হিসাব এলোমেলো হয়ে যায়। পরিপূর্ণ এক নারী হয়ে ওঠার দুয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা জয়নবকে অন্য এক নারী মনে হয় বকুলের। যে নারীর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে বাধা দেয় মন।

ভিতরটা কেঁপে ওঠে বারংবার। স্বামীর অবিশ্বাসে পর্যুদস্ত এক নারী সে। জীবন তার কাছে নিকষ কালো গভীর কুয়োর জল। যে জলের ভিতর অমানবিক ডুবে গিয়ে জীবনের ওপর মোহ হারিয়েছে বকুল। জয়নবকে তাই সে স্বচ্ছ পানিতেও ডুব দিতে দেবে না। শক্ত খুঁটি খুঁজতে থাকে বকুল। ওকে বেঁধে রাখতে হবে। পথ হারাতে দেওয়া যাবে না।

শুক্রবার দেখে সুলেমানকে আসতে বলেছিল সে। তার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। কাজের সন্ধানে ঢাকা এসেছে। এককালে অবস্থা, সম্পত্তি খারাপ ছিল না তার। সুলেমানের বাবা পাট পাট ভাজ করা লুঙ্গি পরত। লুঙ্গির ট্যাঁকে টাকা গুঁজত। আতর মাখত বেহুঁশভাবে। কোঁকড়া, তেল চিটচিটে চুলে থাকে থাকে ভাজ ফেলত। তার নিজের অবস্থা বাপের মতো এতটা ভালো না হলেও খারাপ ছিল না। সেই সুলেমান স্ত্রীর অসুখে সর্বশান্ত হয়েছে।

অভাবের কোনো নিয়মকানুন নেই। পেটের দায়ে গ্রাম তাকে ছাড়তেই হলো। প্রথমে গিয়েছিল আপন ভাইয়ের বাসায়। দিন পনেরো যেতে না যেতেই বোঝা শেষ, নগর জীবন কত নিষ্ঠুরতায় ঠেসে আছে। বকুলের কথা হঠাৎ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল তার শয্যাগত বউ।

বকুলও তখন একজন অভিভাবক খুঁজছিল মনে মনে। জয়নবের মাথার উপর কর্তৃত্ব নিয়ে যে দাঁড়াতে পারবে।

ঘরের সামনে এক চিলতে জায়গা। একজন মানুষ দাঁড়াতে পারে কোনোমতে। সুলেমান এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। ঘরের মধ্যে চকির ওপর শুয়ে আছে পারুল। বসতে দেওয়ার মতো চেয়ার কিংবা মোড়াও নেই। বাধ্য হয়ে চকির এক কোণে গুঁটিসুটি মেরে বসতে হয়েছে সুলেমানকে।

পারুল জিজ্ঞেস করল, ঢাকায় কবে আইছেন?

-মাসখানেক হইব।

বকুল বাঁধা দিয়ে বলল, আপনে না কইলেন বিশ-পঁচিশ দিন।

-আমার ঠিক মনে নাই।

সুলেমানকে উদ্ধার করতে পারুল বলল, পনেরো-বিশদিন আর এক মাসের মধ্যে কী এমন তফাত!

বকুল মুড়ি, বিস্কুট খেতে দিলে পারুল ক্ষেঁপে গিয়ে বলল, ভাত না দিয়া এইসব কী দিলি?

-আমি খুচরা খাবারই পছন্দ করি। গপাগপ মুড়ি, বিস্কুট শেষ করল সুলেমান।

পেট ভরে সে কতদিন খায়নি। কে জানে। অবাক বিস্ময়ে তার খাওয়া দেখতে লাগল পারুল। আপাতত তার কোনো কাজ নেই। যাদের কাজ থাকে না চারদিক দেখাই তাদের প্রধান কাজ। সুলেমানের কপালে কয়টা ভাঁজ গুণে দেখল পারুল। দাঁতের ফাঁকের জমানো ময়লাও দৃষ্টি এড়ায় না তার। কতকাল সাবান দিয়ে ভালো করে গোসল করেনি। সে হিসাব মেলাতে না পেরে বকুলকে বলল, ওনারে গোসলের জন্য সাবান-গামছা দে। ফেরেশ হওয়া দরকার। তা না হইলে ভালো ঘুম হইব না রাইতে।

বিকেলের দিকে গোসলখানা খালি থাকে। বেশ সময় নিয়ে সাবান ঘষে গোসল সারল সুলেমান। অনেকদিন পরে তার বাম পায়ের হাঁটুর ব্যথাটা সে টের পেল না।

নিবন্ধ

# কেমন আছেন আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠী

**মিনার মনসুর**

আজীবন সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। শেষ কর্মস্থল ছিল রাজধানীর নামি একটি কলেজ। অবসর গ্রহণের পর মোহাম্মদপুরের তিনতলা একটি বাড়িতে একা থাকতেন তিনি। বাড়িটি তাঁর নিজের। স্বামী হারিয়েছেন অর্ধযুগেরও বেশি সময় আগে। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। দুই সন্তানকেই (এক ছেলে ও এক মেয়ে) মানুষের মতো মানুষ করেছেন। তারা বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। একদিন নিজ গৃহেই খুন হয়ে যান প্রবীণ এই ভদ্রমহিলা। মৃত্যুর পর জানা গেল যে, তাঁর অর্থবিত্ত কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু বড়ো নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। বাড়ির দীর্ঘ বারান্দায় বসে অপেক্ষার প্রহর গুণতেন, যদিও জানতেন সন্তানেরা কেউ দেশে ফিরবে না। যার ওপর নির্ভর করতেন, দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সেই কাজের লোকটিই লোভে পড়ে খুন করে ফেলে নিঃসঙ্গ এ মানুষটিকে। ঘটনাটি প্রায় দুই দশক আগের। কিন্তু আগে-পরে একই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে রাজধানীতে। ঘটছে মাঝেমধ্যেই।

জালালুদ্দিনের কাহিনি আরো করুণ। দক্ষিণাঞ্চলের নিরক্ষর এ মানুষটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যৎসামান্য জমিকে সম্বল করে সারাজীবন প্রাণান্ত পরিশ্রম করে সাতটি সন্তানকে লালনপালন করেছেন। প্রত্যন্ত একটি গ্রামে থেকেও শিক্ষিত করেছেন তিন মেয়েকেই। ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। খুব সচ্ছল না হলেও সন্তানেরা চাকরি ও দোকানদারি করে তার তুলনায় ভালো জীবনযাপন করছে। একদিন হঠাৎ করে মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বন্ধ হয়ে যায় তার খেতের কাজকর্ম। চিকিৎসা তো দূরের কথা, ঠিকমতো খাবারও জোটে না। স্ত্রী মারা গিয়েছিল আগেই। অসহায় এ মানুষটিকে নিয়ে তার সন্তানদের মধ্যে কদিন রশি টানাটানি চলে। কেউ তার দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারপরও এক মেয়ে বাবাকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের প্রবল আপত্তির মুখে সেটাও সম্ভব হয়নি। একদিন তার সন্তানেরাই অসুস্থ অচল পিতা জালালুদ্দিনকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে– যে বাড়িটি তার নিজের হাতে বানানো।

শুনতে যত খারাপই লাগুক, বাস্তবতা হলো প্রবীণরা ভালো নেই। যার অঢেল আছে তিনি যেমন ভালো নেই, তেমনি যার কিছুই নেই– তিনিও খুব কষ্টে আছেন। দুজনের সমস্যা দুরকম। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে। ভাগ হয়ে গেছে জমিজমা সবই। দরিদ্র এবং সীমিত আয়ের মানুষের সাধ থাকলেও পিতামাতার ভরণপোষণের সাধ্য নেই। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবার সচ্ছল ও সামর্থ্যবানদের একক পরিবারটিও খণ্ডিত হয়ে পড়ছে নানা কারণে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানেরা চলে যাচ্ছে বিদেশে। একান্নবর্তী পরিবারে প্রবীণরা শুধু যে সুরক্ষিত ছিলেন তাই নয়, সেখানে তাদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। সেই কাঠামো ভেঙে যে একক পরিবার গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিও খুব মজবুত নয়। সেখানে প্রবীণদের যদি ঠাঁই হয়ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তাদের ভূমিকা হয় শূন্য অথবা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। ফলে বেশিরভাগ বাবা-মাই সন্তানের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ে স্মৃতির মণিমুক্তো খচিত নিজের কুঁড়েঘরটিকেই আঁকড়ে থাকতে পছন্দ করেন।

বস্তি বা অ্যাপার্টমেন্টকেন্দ্রিক একক পরিবারগুলোতে একে তো পরিসর ছোটো, তার ওপর শিক্ষা ও জীবিকার প্রয়োজনে ক্ষুদ্রাকৃতির সেই পরিবারের সদস্যরাও ছড়িয়ে পড়ছেন দেশে-বিদেশে। দম ফেলবার ফুরসত নেই কারোই। এমনকি স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাগুলোও নানা ধরনের কোচিং আর বইয়ের ভারে ন্যুব্জ।

তার ওপর রয়েছে ভিডিও গেম, কার্টুন আর মোবাইল ফোনের সর্বগ্রাসী নেশা। প্রবীণ দাদা-দাদি বা নানা-নানিকে সময় দেওয়ার মতো সময় কোথায় তাদের! শুধু যে বাসগৃহের আয়তন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তাই নয়, ছোটো হয়ে গেছে আমাদের মনের পরিসরও। ব্যাপকভাবে বদলে গেছে প্রবীণদের প্রতি সমাজের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। বংশানুক্রমিক মমতার জায়গাটি দখল করে নিয়েছে টিকে থাকার রূঢ় বাস্তবতা। একদিকে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধিজনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ, অন্যদিকে বদলে যাওয়া মানসিকতার কারণে প্রবীণদের অসহায়ত্ব দিন দিন বাড়ছে। বলা বাহুল্য, এ বাস্তবতা আমাদের একার নয়।

সুসংবাদ হলো, বিশ্বব্যাপী মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। সে সঙ্গে বাড়ছে প্রবীণদের সংখ্যাও। আর দুঃসংবাদ হলো একই সঙ্গে বাড়ছে সমস্যা। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, জীবনমান ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক নানা কারণে গড় আয়ু বৃদ্ধির এই হার যেমন অব্যাহত থাকবে, তেমনি বিশ্বজুড়েই বৃদ্ধি পাবে প্রবীণ জনসংখ্যার হারও। ফলে যে নতুনতর বাস্তবতার সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে জাতিসংঘ 'মানবজীবনের প্রধানতম' চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেছে। এ মন্তব্য বা মূল্যায়ন যে অযথার্থ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বার্ধক্যের সমস্যাটি বাহ্যত ব্যক্তিগত মনে হলেও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তার অভিঘাত মোটেও সামান্য নয়। জাপানসহ উন্নত দেশগুলোকে অনেক আগেই এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ততটা প্রকটভাবে না হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও এখন অনুরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের বাস্তবতাও যে ভিন্ন নয় এ নিবন্ধের শুরুতেই তার কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এ কারণে যে, প্রায় সিকি শতাব্দী আগে তারা সঠিকভাবেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তারই প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯১ সাল থেকে ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষও পালিত হয়েছে ১৯৯৯ সালে। উদ্দেশ্য একটাই, প্রবীণদের অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেতন করা। এবারের প্রতিপাদ্যও ভিন্ন নয়। বয়সভিত্তিক বৈষম্য ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জোরালো আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। সে সঙ্গে প্রবীণদের ওপর এ ধরনের বৈষম্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কেও সতর্ক হতে বলেছে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের এই আহ্বান ও অবস্থানের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গত দুদশকে প্রত্যাশিত আয়ু গড়ে ৯ বছর বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে একটি নবজাতকের প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৬০ বছর। ২০১২ সালে তা প্রায় ৭০ বছরে উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্যে ৬০ বছর ও তদূর্দ্ধ এবং উন্নত অঞ্চলের জন্যে ৬৫ বছর ও তদূর্দ্ধ বয়সিদের প্রবীণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সেই মানদণ্ড অনুযায়ী, দেশে এখন প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০৫০ সালে এই হার ২০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম আতীকুর রহমান যে উদ্বেগজনক চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাঁর মতে, ১৯১১ সালের প্রায় ১৪ লাখ প্রবীণের মধ্যে বাংলাদেশে বর্তমানে বাস করছেন প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ প্রবীণ (৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি)। প্রতি বছর বাংলাদেশের জনসংখ্যায় যোগ হচ্ছে প্রায় ৮৫ হাজার নতুন প্রবীণ। ২০২৫ এবং ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে প্রবীণদের মোট সংখ্যা হবে যথাক্রমে প্রায় ২ কোটি এবং সাড়ে ৪ কোটি। তারা দ্রুত বর্ধনশীল এবং আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের মোট প্রবীণের সংখ্যা শিশু জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। দেশে প্রতি ১২ জনের একজন বর্তমানে প্রবীণ বয়সি; ২০৫০ সালে তারা হবেন প্রতি পাঁচজনের একজন। আজকের বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান ২০টি প্রবীণ জনসংখ্যাধিক্য দেশের একটি। ২০২৫ সালে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক প্রবীণ জনগোষ্ঠী বসবাস করবে বাংলাদেশসহ এশিয়ার আরো চারটি দেশে।

কিন্তু আমরা কি প্রস্তুত এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য? সরকার যে খুবই সচেতন ও আন্তরিক তার প্রমাণ অনেক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণটি হলো বয়স্ক ভাতা। সম্পদ ও সামর্থ্যের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শুধু ২০১৪-১৫ অর্থবছরেই জনপ্রতি ৪শ টাকা হারে ২৭ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৩শ কোটি টাকারও বেশি। পাশাপাশি চালু আছে বিধবা ভাতাও। এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রবীণদের ৭৮ শতাংশই হলো বিধবা। এসব কার্যক্রমের জন্য বর্তমান সরকার প্রশংসা পেতে পারে। কারণ তারাই ১৯৯৮ সালে সীমিত পরিসরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম শুরু করেছিল। পাশাপাশি সম্প্রতি সন্তানের জন্য পিতামাতার ভরণপোষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দায়িত্বে অবহেলার জন্য রাখা হয়েছে শাস্তির বিধানও। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র ও আয়কর রেয়াতসহ নানাভাবে সরকার প্রবীণদের পাশে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রহণ করা হয়েছে একটি জাতীয় প্রবীণ নীতিও। তারপরও এ কথা বলা যাবে না যে, সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত আছি। কারণ একে তো সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতার তুলনায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো খুবই অপ্রতুল, তদুপরি প্রবীণরা প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সে বিষয়ে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা নেই বললেই চলে।

বিশ্বের সর্বত্রই প্রবীণদের সমস্যার ধরন প্রায় অভিন্ন হলেও বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তার রূপটিকে আরো নির্মম করে তুলেছে দারিদ্র্য। পিতামাতার প্রতি মমত্ববোধের কোনো অভাব না থাকলেও শুধু দারিদ্র্যের কারণেই তাদের ভরণপোষণে অক্ষম বা অপারগ পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আবার উন্নত দেশগুলোর মতো অসহায় এই প্রবীণদের দায়িত্ব গ্রহণের মতো কার্যকর কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক উদ্যোগও গড়ে ওঠেনি অদ্যাবধি। মধ্যবিত্ত কিংবা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল মানুষদের সমস্যাও কম জটিল নহে। আর্থিক সামর্থ্য হয়ত তাদের আছে, কিন্তু প্রবীণ পিতামাতাকে দেখাশোনা করবে কে? বহু পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মজীবী। সন্তানেরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে বয়স যত বাড়তে থাকে বয়স্ক মানুষের নানাবিধ নির্ভরতাও তত বেড়ে যায়। বৃদ্ধি পায় নিঃসঙ্গতা। এই কঠিন সময়ে তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা যতটা জরুরি, মায়া-মমতা ও সঙ্গ তার চেয়ে কোনো অংশে কম জরুরি নয়। কিন্তু পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা যে এখনো প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারিনি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরতদের অবসর গ্রহণের একটি বয়সসীমা নির্ধারিত আছে। আছে পেনশনের ব্যবস্থাও। কিন্তু যে বিপুলসংখ্যক মানুষ কৃষি, শিল্প ও দিনমজুরসহ বেসরকারি খাতে নিয়োজিত আছে তাদের খবর বলতে গেলে কেউ রাখে না। এক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক শুধু নয়, ক্ষেত্র বিশেষে নির্দয়ও বটে। গড় আয়ু বাড়ছে। অথচ পঞ্চাশোর্দ্ধ ব্যক্তিকেও তার কর্মস্থলে নানা ধরনের অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়। এমনকি মুখোমুখি হতে হয় কর্মচ্যুতির মতো কঠিন পরিস্থিতির। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ন্যায্য পাওনাটুকুও জোটে না তাদের ভাগ্যে। এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু যে তাদের ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় তা নয়, বরং শারীরিক এবং মানসিকভাবেও বিপন্ন করে তোলে ভুক্তভোগী মানুষটিকে। কারণ সমাজ ও পরিবারের কাছেও তিনি ছোটো হয়ে যান বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন।

উন্নত দুনিয়ায় 'সিনিয়র সিটিজেন' শব্দটি বেশ সম্মানের। রাষ্ট্রীয় ভাতা শুধু নয়, বিশেষ গুরুত্বও তারা পেয়ে থাকেন সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা এখনো সুদূরের স্বপ্ন। বাংলাদেশের অবস্থাও ভিন্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারপরও কতগুলো বিষয়ে এখনই বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। বয়স্ক ভাতার পরিধি ও পরিমাণ দুটোই বাড়াতে হবে। কারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবীণদের ক্ষেত্রে এটা যে খুবই কার্যকর তা প্রমাণিত। তবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তসহ সীমিত আয়ের প্রবীণদের কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। পরিবার সঞ্চয়পত্রসহ অন্যান্য সঞ্চয় প্রকল্পগুলো এক্ষেত্রে একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। প্রবীণদের একটি বড়ো অংশ এসব সঞ্চয়পত্রের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। সরকারের নীতি নির্ধারকদের বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনায় রাখতে হবে। সংগত কারণেই ব্যাংকিং মারপ্যাঁচের ঊর্দ্ধে রাখতে হবে সঞ্চয়পত্রকে। এসবের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব প্রবীণদের রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি নজর দিতে হবে তাদের চিকিৎসা সহায়তা ও যাতায়াতের দিকেও। ষাটোর্দ্ধ নাগরিকদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে চিকিৎসা ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠানে হ্রাসকৃত মূল্য বা বিশেষ ভরতুকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বিশেষ পরিচয়পত্র বা কার্ড ইস্যু করা যেতে পারে তাদের নামে।

সর্বাপেক্ষা জরুরি হলো, প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে কেবল প্রবীণদের জন্য অত্যাবশ্যক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখাই যথেষ্ট নয়, একই সঙ্গে আনন্দময় একটি পারিবারিক আবহও নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বৃদ্ধাশ্রমের ব্যাপারটি নিয়ে সমাজে যেমন এখনো প্রবল বিরূপতা আছে, তেমনি শত সমস্যা সত্ত্বেও ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠী এখনো পরিবারের সঙ্গেই থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে বাস্তব কারণে ক্রমেই সেটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। অতএব, প্রবীণদের ভবিষ্যৎ নিবাস হিসেবে বৃদ্ধাশ্রমগুলোকে যতদূর সম্ভব এ শূন্যতা পূরণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বদলাতে হবে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। আর সব কাজ যে কেবল সরকারকেই করতে হবে এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। বেসরকারি সংস্থা, এমনকি ব্যক্তি-উদ্যোক্তারাও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। কারণ এ ধরনের উদ্যোগের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।

***লেখক :** প্রাবন্ধিক, কবি ও সাংবাদিক*

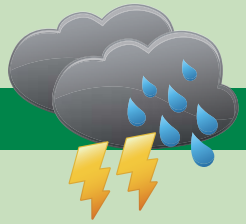

নিবন্ধ

# বাংলাদেশের দুর্যোগ পরিস্থিতি ও সচেতনতা

**শামস সাইদ**

যে–কোনো দুর্যোগই মানবজীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। সে হোক প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। নানা নামে পরিচিত ভয়ংকর সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আঘাত হানে। বিপন্ন করে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ–পরবর্তী সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে রোধ- প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও ব্যবস্থাপনা ও সতর্কতার মাধ্যমে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সর্বকালেই ছিল। তবে অতীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জান ও মালের যে পরিমাণ ক্ষতি হতো এখন সে রকম ক্ষতি হচ্ছে না। এটা কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কারণে জান ও মালের ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন করা হয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৮৯ সালের ৪৪তম অধিবেশনের ২৩৬ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘ ৯০ দশকটি (১৯৯০-৯৯ সাল পর্যন্ত) আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক হিসেবে পালন করেছে। জাতিসংঘের ব্যাখ্যা মতে, তার লোগোটি দুর্যোগ থেকে পৃথিবী রক্ষার প্রতীক। দিবসটি প্রতিপালনের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্বের সব জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন করে তোলা এবং একটি সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। দুর্যোগ মানেই ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের একটি করুণ চিত্র। আমরা প্রাকৃতিক সকল বিপর্যয়কেই দুর্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি। অর্থাৎ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ফসলে মড়ক, প্রাণিকুলে সংক্রামক রোগ– যা আমাদের সম্পদ বিনষ্ট করে তা সবই দুর্যোগের আওতায়। দুর্যোগকে ইউএনএফপি সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে,'চরম প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ যখন মানুষ ও তার আশ্রয় এবং মানব জীবনযাত্রা ও সম্পদসহ সমগ্র পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখনই সেটা দুর্যোগ। এছাড়া মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধ ও নানারকম পরিবহণ দুর্ঘটনা।

দুর্যোগ প্রশমন নিয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই চলে আসে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি। জলবায়ু একদিনে পরিবর্তন হয়নি। এটি দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়া। অতীতে আমাদের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডই আজকের জলবায়ু পরিবর্তনের এই নেতিবাচক প্রভাব এবং অতিমাত্রার দুর্যোগের অন্যতম কারণ। ডারবান বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে উপস্থাপিত দেশভিত্তিক প্রতিবেদনে কার্বন নিঃসরণের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশ যেখানে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ দশমিক ৩ টনেরও কম, সেখানে উন্নত বিশ্বের একজন নাগরিক ১০ থেকে ২০ টন পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা ১০ হাজার ভাগের মধ্যে মাত্র ৭ ভাগ। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের প্রথম ও নির্মম শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। দারিদ্র্য, সুশাসনের অভাব, দুর্বল অবকাঠামো আমাদের আরো বিপদাপন্ন করে তুলছে। 'দি ক্লাইমেট চেঞ্জ ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স' নামের এক জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা এশিয়ার ১৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পার্শ্ববর্তী ভারত। সবচেয়ে কম ঝুঁকিতে রয়েছে নরওয়ে। একই তথ্য দিয়েছে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি)। জাতিসংঘের ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) প্রণীত প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংকলন বা চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাংলাদেশের ঝুঁকি সম্পর্কিত ভয়াবহ তথ্য প্রদান করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, গত ১৪ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৮) বাংলাদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতার হার ছিল মে মাসে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নভেম্বরে .০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বঙ্গোপসাগরে মৌসুমি নিম্নচাপ বৃদ্ধির প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বার বার প্লাবিত হচ্ছে। সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার ভেতরের খালগুলো দিয়ে লবণপানি প্রবেশ করে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি-কৃষি ও মৎস্য চাষের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, কৃষিতে

জলবায়ু পরিবর্তনের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাতে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ধান ও গম উৎপাদন হ্রাস পাবে যথাক্রমে ৮ ও ৩২ শতাংশ।

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের বলয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানেও রয়েছে। ১৯৭৯ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ কর্তৃক ভূমিকম্প সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, সিলেট এবং ভারতের আসাম অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে অবস্থান করছে ভূগর্ভস্থ টেকটোনিক প্লেটের এক বিশাল সংযোগ স্থল বা ফাটল। ভূতত্ত্ববিদরা এই ফাটল স্থলকে চিহ্নিত করেছেন ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ একটি অঞ্চল হিসেবে। সম্প্রতি বাংলাদেশে কয়েকবার ভূকম্পন অনুভূতও হয়েছে। তাছাড়া ভারত মহাসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগর হয়ে বাংলাদেশ উপকূল পর্যন্ত বিশাল এই সাগর তলদেশে শত শত বছর ধরে পুঞ্জিভূত হয়ে আছে টেকটোনিক প্লেটগুলোর পারস্পরিক চাপ। যে-কোনো সময়ে প্লেটের স্থানচ্যুতিতে সৃষ্ট হতে পারে সাগর তলদেশের ভূমিকম্প বা সুনামি। তাহলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এইরূপ সুনামিতে দক্ষিণের সাগরের পানি উত্তরে আসতে আসতে একেবারে চাঁদপুর মোহনা পর্যন্ত চলে আসতে পারে। আর যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে মহা ধ্বংসযজ্ঞের আরেক ইতিহাস রচিত হবে।

তবে বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ও দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতায় ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার পরও নিজস্ব অর্থায়নে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে গোটা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের কোনো দেশের নিজস্ব তহবিলে এ ধরনের ফান্ড গঠনের কোনো নজির নেই। এ পর্যন্ত এ ট্রাস্ট ফান্ডকে সরকারি তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া ৩ হাজার কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়েছে ৩৬৮টি প্রকল্প। পাশাপাশি বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটিও বিশ্বে প্রথম। প্রণয়ন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইনসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা। আর এসব কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' প্রদান করা হয় গত বছর।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে জলমগ্নতা ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, অনিয়মিত ও অতি বৃষ্টিপাত, বন্যা, নদী তীরের ভাঙন, খরা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূমিধস এবং কৃষি উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। এ অবস্থা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের হুমকি। গত কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সিডর, আইলা ও মোহসিনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলবায়ুর পরিবর্তনেরই প্রভাব। এ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়ছে। গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অতি খরা দেখা দেওয়ারও কারণ এটা।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার দায়িত্ব নিয়েই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। শুধু তাই নয়, ফান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০। গঠন করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডও। নিজস্ব অর্থায়নে এ ফান্ড গঠন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে নতুন করে পরিচিত করে তোলে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান এইড, ডেনমার্ক, ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও ইউএসএআইডি এ ফান্ডে সর্বমোট ১৮ দশমিক ৯৫ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের বোর্ড সদস্য, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের সদস্য, এডাপটেশন ফান্ড বোর্ড সদস্য এবং এডাপটেশন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

শেখ হাসিনাকে চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার দেওয়া প্রসঙ্গে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক অচিম স্টেইনারের বরাত দিয়ে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনকে দেশে জাতীয় অগ্রাধিকার ইস্যু এবং একই সঙ্গে এ বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে জোরালো ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্ব এবং দূরদৃষ্টি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচির অগ্রগামী বাস্তবায়নকারী এবং অভিযোজন নীতির স্বপক্ষের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে শেখ হাসিনা অন্যান্যের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আরো বলা হয়, বিশ্বের অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিনিয়োগ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ। প্রতিবেশগতভাবে ভঙ্গুর বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাঁর সরকারের সামগ্রিক পদক্ষেপের স্বীকৃতি দিতে এ পুরস্কার তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বলা হয়, বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনমূলক নীতিগত পদক্ষেপ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বাংলাদেশ তার উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রম থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন সংরক্ষণ আইন

প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সচেতন হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ এখন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর বিপর্যয় রোধে সারা বিশ্ব এখন সোচ্চার। পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য রাখতে বিশ্বের কিছু ভালো মানুষ উদ্যোগ নিচ্ছেন, তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নির্দেশনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার পরও নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করা হয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড, যা বিশ্বের কোনো দেশ গঠন করেনি। এজন্য বিশ্বের অনেকেই তাঁকে 'ধরিত্রী কন্যা' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সাইটেশনে আরো বলা হয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১১ সালে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে রাষ্ট্রকে সাংবিধানিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে জলাভূমি এবং বন্যপ্রাণী রক্ষাকে প্রাধিকার দিয়ে শেখ হাসিনার সরকার গৃহীত বন নীতিমালা আবহাওয়ার বেশকিছু চরমভাবাপন্ন অবস্থার প্রতিকার হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি দেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজনে বস্তুগত এবং আর্থিক বিনিয়োগ ছাড়াও সরকার ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মোকাবিলায় জনগণকে প্রস্তুতি গ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে বন্যাজনিত কারণে পানিবাহিত রোগ নিরাময়ে স্বাস্থ্যসেবা, আগাম সতর্কীকরণে কমিউনিটি দল গঠন এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিতে উৎসাহ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া সরকার দেশের সবচেয়ে বৃহৎ গ্যাস নির্গমন উৎস ইটভাটা থেকে গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পদক্ষেপ নিয়েছে। পরিবেশ, মানব স্বাস্থ্য রক্ষা এবং জীবিকা সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে জাহাজ-ভাঙা শিল্প যাতে উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ বিনষ্ট না করতে পারে সেজন্য নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশ নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর ঝুঁকিপূর্ণ অন্য দেশের জন্যও কাজ করছেন। বিশ্ব সভায় তিনি তুলে ধরেছেন জলবায়ু পরিবর্তনে এসব দেশেরও যে ক্ষতি হচ্ছে।

আমরা দেখেছি, যে–কোনো দুর্যোগেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নারী ও শিশু। সে আমাদের দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক। সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক আর মানবসৃষ্ট হোক। পৃথিবীতে সাত বিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই নারী। দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতির ক্ষেত্রে পরিবারের মা ও বোনেরা প্রথম উদ্যোগ নেন। দুর্যোগ চলাকালে নিজেরা না খেয়ে পরিবারের সদস্যদের আগে খেতে দেন। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালান পরিবারকে টিকিয়ে রাখার। আবার দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকাণ্ডেও পরিবারের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নারীরা। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি স্তরে, কর্মে নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্তে নারী ও বালিকার ক্ষমতায়ন ও অভিগমন নিশ্চিত করতে পারলে দুর্যোগ নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী ও শিশুর মতো ঝুঁকিতে থাকেন প্রতিবন্ধীরাও। আমরা বিপদের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ভুলে যাই নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের কথা। এ সময় তাদের প্রতি অবহেলাও বেড়ে যায়। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকালে এবং দুর্যোগ-উত্তর জরুরি সাড়া দানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিক গুরুত্ব ও দৃষ্টি দিতে হবে। দুর্যোগকালে সকল ভেদাভেদ ও মানসিক দূরত্ব কমিয়ে সাধ্য মতো সহায়তার হাত বাড়িয়ে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

তাই দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ–পরবর্তী সময়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কিংবা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিতে পারি তা হলো– পরিবেশ শিক্ষার আদলে পরিবেশের সবকটি বিষয় নিয়ে বিশেষ করে দুর্যোগ শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আলাদা বিষয় চালু করা। যেহেতু নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানছে। তাই শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মিত এ বিষয়গুলো জানানোর লক্ষ্যে নিয়মিত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা, পাঠ্যপুস্তকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ পূর্বক এসব দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় কী তা বিস্তারিত আলোচনা করা, মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলা যাতে তারা পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগীর ভূমিকা পালন করে, পাঠ্যপুস্তকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ কী কারণে সংগঠিত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে পাঠ্যপুস্তকে উভয় দুর্যোগের ভয়াবহতার চিত্রসহ এ থেকে পরিত্রাণের উপায় উল্লেখ করা। বাস্তবতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নকালে বাস্তবতার সাথে মিল খুঁজে পায়। শিক্ষার্থীদের শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নয় বরং বিশ্বের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আঘাত হানা দুর্যোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে এসব বিষয়গুলো শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দুর্যোগের করাল গ্রাস থেকে রক্ষার পাশাপাশি এ সুন্দর পৃথিবীকে আরো সুন্দর ও বাসযোগ্য করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের করণীয় কী সবারই এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা পরবর্তী প্রজন্মকে দুর্যোগের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্য: বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন পত্রিকা।

*লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক*

নিবন্ধ

# জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি : সতর্ক হওয়ার এখনই সময়

**নাজনীন সুলতানা নীতি**

বলা হয়ে থাকে, বহুল আলোচিত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনার সঙ্গেই কিংবা তারও দীর্ঘ পূর্বে পৃথিবীতে যখন বরফ যুগের অবসান হলো। মানদণ্ডে পরিমাপের নিরিখে তৎকালীন উষ্ণতা বৃদ্ধির হার ক্ষীণ হলেও বর্তমান একুশ শতকের বিশ্বে যে সেটি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। মজার ব্যাপার হলো বিষয়টি নিয়ে যখন ক্রমাগত উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চলছে, একটি সফল আলোচনার অনুপস্থিতিতে উভয় পক্ষে এক ধরনের স্নায়ুগত দ্বন্দ্ব চলছে তখন কিছু মানুষ বিষয়টির অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিহান। বৈশ্বিক উষ্ণতা ইস্যুটিকে অনেক ক্ষেত্রের তারা লোকমুখে প্রচলিত ভূতুড়ে গল্প মনে করে। আবার বিখ্যাত আমেরিকান জরিপ প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ (Gallup)-এর বিশ্বব্যাপী ১২৭টি দেশের উপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা বা মোটামুটি ভালো ধারণা রয়েছে। এমন ব্যক্তির সংখ্যা লাইবেরিয়াতে সবচেয়ে কম ১৫ শতাংশ এবং জাপানে সবচেয়ে বেশি ৯৯ শতাংশ। আফ্রিকার বেশিরভাগ জনগণ এ বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা রাখে। জরিপের ১২৭টি দেশের জনগণের মধ্যে ৬২ শতাংশ বিষয়টি অবগত থাকলেও বাকি ৩৮ শতাংশ এ সম্পর্কে কখনো শোনেননি বা এ বিষয়ে তাদের কোনো মত নেই বলে জানা যায়। বর্তমানে প্রায় ৬১ শতাংশ জনগণ বাস্তবিকভাবে বিশ্বাস করে বিগত কিছু দশক ধরে পৃথিবীতে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে যেখানে ৬৫ শতাংশ ব্যক্তি মনে করে বৈশ্বিক উষ্ণতার কোনো বস্তুগত প্রমাণ নেই। বরং এর বিপক্ষে নেওয়া যে-কোনো পদক্ষেপ জাতীয় অর্থনীতি ও সার্বিকভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যখন বিবিধ তখন জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ এর কারণগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, এর সম্ভাব্য পরিণতি এবং একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে একে প্রতিহত করার উপায় নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় এ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ৪০ শতাংশ যার একটি প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অন্যান্য কারণতো রয়েছেই। ইতোমধ্যেই ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দশককে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণতম দশক ঘোষণা করা হয়েছে। আতঙ্কের বিষয় হলো ১৮৮০ এরপর থেকে এ পর্যন্ত যে কটি উষ্ণতম বছর গণনা করা হয়েছে ২১ শতকের প্রতিটি বছর তার অন্তর্ভুক্ত। জলবায়ু বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল সম্প্রতি সতর্কবাণী দিয়েছে, উষ্ণতা বৃদ্ধির এ হার ধারাবাহিক থাকলে ২১০০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৪° থেকে ৫.৮° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। যার পরিণতি হবে জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অধিক দুর্যোগের সম্ভাবনা এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির দরুন পৃথিবীর উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের বিলীন হয়ে যাওয়া। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান মাপলক্রফটের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে

বলা হয়, বিশ্বব্যাপী ৩২টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এরমধ্যে নিচু দেশ হওয়ার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। এর সাথে যুক্ত হবে বিপুল প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির বিলুপ্তিকরণ প্রক্রিয়া যা বাস্তুসংস্থানকে বিপর্যস্ত করে দিবে। বলা হচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অধিক উষ্ণতা পৃথিবীব্যাপী শীতকালে পরিধি কমিয়ে দিচ্ছে যা আমাদের দেশেও লক্ষণীয়, বসন্ত সময়ের আগেই আবির্ভূত হচ্ছে, বৃষ্টি কম হচ্ছে কোথাওবা অতিরিক্ত হচ্ছে, গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব থাকছে বেশি। ঋতুর দ্রুত পরিবর্তন প্রাণিজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে কারণ এর সাথে তাদের বাসস্থানের পরিবর্তন, খাদ্যের সংস্থান ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত। উত্তর গোলার্ধের বরফের গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী ১০০০ বছরেও সময়ের মধ্যে শ্বেত ভাল্লুকের বিলুপ্তি ঘটবে। ৯৮৬৫টি পাখির প্রজাতি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী পোকামাকড় প্রজাপতি, মথ প্রভৃতি বিলুপ্তির সর্বোচ্চ হুমকিতে রয়েছে। ৫৫০০–এর উপর স্তন্যপায়ী প্রজাতির সংখ্যাগত পরিমাণ কমে যাচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে বানর, লেমুর, শিম্পাঞ্জী, শুশুক, ডলফিন, তিমি ইত্যাদি। এছাড়াও হুমকির মুখে রয়েছে ৩০ লাখ উদ্ভিদ প্রজাতি যা বিশ্বব্যাপী ওষুধ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। আবহাওয়া বা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমুদ্রের ভূমিকা ব্যাপক। কারণ মানব সমাজে মানব সৃষ্ট কর্মকাণ্ডে নির্গত সবচেয়ে স্থায়ী গ্রিন হাউজ গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বেশিরভাগ শোষণ করে সমুদ্র ও গাছপালা। কিন্তু কার্বন গ্যাসের পরিমাণ সমুদ্রের শোষণ ক্ষমতার তুলনায় বেশি হলে সমুদ্রে ক্ষারের মাত্রা বেড়ে গিয়ে কঠিন ক্যালসিয়াম কার্বনেটের আস্তরণযুক্ত প্রবালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে–যা সামগ্রিক ইকোসিস্টেমের জন্য শুভ নয়। বিজ্ঞানীদের মতে, তাপমাত্রার ৩.৬° ফারেনহাইট বৃদ্ধি ৯৭ শতাংশ প্রবালের বিলুপ্তির কারণ হতে পারে।

এই পিলে চমকানো পরিসংখ্যানগুলো স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের জাতিরাষ্ট্রগুলোকে ভাবিয়ে তুলেছে। ১৯৯২ সাল থেকে ১৬০টি দেশের প্রতিনিধিগণ গ্রিন হাউজ গ্যাস (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড) কমানোর উপায় বৈঠক শুরু করেন। জাতিসংঘের ক্লাইমেট চেঞ্জ কনভেনশনের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটোতে কিয়োটো প্রটোকল নামে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– যাতে এখন পর্যন্ত ১৯২টি দেশ স্বাক্ষর করে এ মর্মে যে, তারা তাদের দেশে কার্বন নিঃসরণ কমাবে নির্দিষ্ট মাত্রায়। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, চুক্তির কার্যকারীতে চুক্তিতে স্বাক্ষর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে। একটি হিসাব অনুযায়ী, শিল্পোন্নত দেশগুলো মোট কার্বন নিঃসরণের ৬৮%–এর জন্য দায়ী আর তারাই সবচেয়ে বেশি অনাগ্রহ প্রদর্শন করে চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে। তথাকথিক পরাশক্তি হিসেবে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে মানবতার কথা বললেও বুশ প্রশাসনের সময় কিয়োটো প্রটোকলের ওপর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। অস্ট্রেলিয়া মাথাপিছু গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের দিক থেকে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেশ হলেও একই সাথে কিয়োটো প্রটোকলের ঘোর বিরোধীতাকারী। অন্যদিকে চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো উঠতি অর্থনীতির দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় তাদের জন্য চুক্তিতে ছাড় রাখা হয়েছে। কিন্তু তারাও ৩৭ শতাংশ গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী। তাদের এ বিষয়ে সতর্ক করা হলেও কোনো সমঝোতামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অনিচ্ছুক। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অসহযোগিতামূলক মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে কিছু ব্যর্থ বৈঠক ছাড়া নতুন কিছু উপহার দিতে পারছে না এ বিষয়ে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে। ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনে আইনি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য একমত হয়েছেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ। অবশ্য কদিন আগে অনুষ্ঠিত অ্যাপেক সম্মেলনে ওবামা প্রশাসনাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধে একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ কার্বন গ্যাস নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কারণ এ দুটি দেশ একাই মোট কার্বন নিঃসরণের ৪৫ শতাংশের জন্য দায়ী।

সর্বসম্প্রতি জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ কিছু আশার বাণী শুনিয়েছেন। আর তাহলো বিজ্ঞানীদের এতদিনের ধারণা অনুযায়ী গাছ যে পরিমাণ কার্বন গ্যাস শোষণ করতে সক্ষম প্রকৃত অর্থে শোষণের পরিমাণ তারও অধিক। ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা তীব্র হারে বৃদ্ধির যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল সেখানে কিছু হলেও স্বস্তির অবস্থা তৈরি হয়েছে। আমার নিউজিল্যান্ডের এক দম্পতি পৃথিবীতে ক্রমশ বর্ধনশীল গ্রিন হাউজ গ্যাসকে অণুজীব ব্যবহারের মাধ্যমে রূপান্তর করে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছেন যা বিপুল অর্থের উৎস হতে পারে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা থেকেও অচিরেই মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সেদিনের অপেক্ষায় রইল বিশ্ববাসী। ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ অনিবার্য।

নিবন্ধ

# বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

**বাকী বিল্লাহ**

শিশু শুধু পিতামাতার পরম আদরের নয়, তারা রাষ্ট্রের সম্পদ। প্রতিটি শিশুর মাঝে লুকায়িত থাকে নানা প্রতিভা। সেই প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলে কাজে লাগাতে পারলে দেশের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিবে। তাই শিশুদের কল্যাণ ও শিশু অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা আরো বাড়াতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোমবার 'বিশ্ব শিশু দিবস' ও 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' পালিত হয়। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো– 'থাকবে শিশু সবার মাঝে ভালো, দেশ সমাজ পরিবারে জ্বলবে আশার আলো'।এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নানা আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সকল শিশুকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পৃথক বাণী দিয়েছেন।

বিশ্বে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নানাভাবে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপরই বিশ্ব পরিমণ্ডলে শিশুদের বিকাশ ও তাদের অধিকার নিয়ে নানা আলোচনা-জল্পনা শুরু হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ওই সময় শিশু অধিকার ও শিশুদের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অবশেষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শিশু অধিকার রক্ষায় ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে ইউনিসেফ ও আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে শিশুদের বিশেষ বিবেচনায় আনার লক্ষ্যে 'প্রথম বিশ্ব শিশু দিবস' উদ্‌যাপন করে। এরপর থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। দিবসটিকে ঘিরে সপ্তাহব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের জন্য ১০টি অধিকার ঘোষিত হয়। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সালকে শিশু দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। এরপর বিশ্বের প্রথম যে ২২টি দেশ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে তারমধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দেশ। শুধু তাই নয়, শিশু অধিকার সনদ ঘোষণার বহু আগে ১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেছেন। একই সঙ্গে শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশ এবং শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন। জাতির পিতা জানতেন, শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশ হলে এই দেশ সোনার বাংলা হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমানে শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরমধ্যে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ ও শিশু আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। পথশিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে সরকার কাজ করছে।

শিশু অধিকার সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে ১৯২৪ সালে জেনেভা ঘোষণায় বলা হয়েছিল, মানব জগতে সর্বোত্তম যা কিছু দেওয়ার আছে, তা শিশুরাই পাওয়ার যোগ্য। পরবর্তীকালে যুগোপযোগী করে নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে জাতিংসঘের সাধারণ পরিষদে ঐতিহাসিক শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করা হয়। এটি শুধু সনদই নয়, বিশ্ববাসীর কাছে মানবাধিকার দলিলও। শিশু অধিকার সনদে রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত দায়িত্বসহ পিতামাতা ও অভিভাবকদের করণীয় ও পালনীয় বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা রয়েছে। এই সনদে প্রথম অনুস্বাক্ষর ও অঙ্গীকারকারী দেশ হিসেবে আজ আমরা গর্বিত। এরপর থেকে দেশে শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি। আর শিশুদের প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরম মমতা ও গভীর আগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৬ সালে সরকার কর্তৃক ১৭ মার্চকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে এবং বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির আলোকে শিশুর সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ- পরবর্তী সময়ে সকল শিশুর সুরক্ষায় সরকার গৃহীত কার্যক্রম এর মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে মাতৃগর্ভ থেকে শিশু তার অধিকার ভোগ করার দাবিদার। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করে মানবজাতিকে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, শিশুকে গর্ভাবস্থা থেকেই নিরাপদ বিকাশের অধিকার দিতে হবে। শিশুর জন্ম– পরবর্তী সুন্দর ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিচালিত হচ্ছে শিশু বিকাশের প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প। আর দুস্থ ও ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালনায় সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে শিশুর খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপদ আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও ঋণদানের মাধ্যমে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পড়াশোনা ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখানোর জন্য বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আর মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠীরূপে গড়ে তুলতে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানসহ নানামুখী কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের উন্নয়নের জন্যও রয়েছে নানা কর্মসূচি ও পরিকল্পনা। সকল শিশুর জন্য সম-সুযোগ ও সম-অধিকার নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই এসব প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও সরকার গ্রামগঞ্জের মেয়ে শিশুর বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আইন করেছে। এছাড়াও দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুদের জন্য সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গিটার, তবলা, অভিনয় ও আবৃত্তিসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শিশু সুরক্ষা এবং শিশুমৃত্যু রোধে পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর ফলে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। এক তথ্যে জানা গেছে, ১৯৯০ সালে প্রতি হাজারে ১৪৬ জন শিশুর মৃত্যু হলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫০ জনে দাঁড়িয়েছে। এভাবে বাংলাদেশে গত এক যুগে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ৭২ ভাগ কমেছে। জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর এক তথ্যে জানা গেছে, ১৯৯০ সালের তুলনায় বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানে ৫৩ শতাংশ কমে গেছে। এই সময় নবজাতকের মৃত্যুর হার কমেছে ৪৭ শতাংশ। প্রতি হাজারে বাংলাদেশে এখন শিশুমৃত্যুর হার ৩৮ জন। মাতৃস্বাস্থ্যেও বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। আর বাংলাদেশের শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ ডায়রিয়া। ডায়রিয়া প্রতিরোধে দেশের ১৩ কোটি ঘরে অন্তত একজনকে খাবার স্যালাইন সম্পর্কে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কারণ একটি বড়ো সাফল্য। শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত এখনো এগিয়ে আছে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের চেয়েও এগিয়ে আছে।

বাংলাদেশের শিশুরা এখনো মেধা ও মননে অনেক এগিয়ে আছে। তাই তাদের মেধা বিকশিত করতে দরকার যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা। সুরক্ষিত পরিবেশ, পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য পেলে তারা জ্ঞানে-গুণে সম্ভাবনা হয়ে উঠবে। তাই ভবিষ্যতে কর্ণধার হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে– তারা যাতে দেশের আলোকিত নাগরিক হয়ে দেশের উন্নয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। তাই শিশুদের দোরগোড়ায় উন্নত জীবনমানের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে কল্যাণমুখী শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশকে অনেক উন্নত করেছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। এখন তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা ভোগ করবে। এতে করে দেশের সার্বিক পরিবেশ হয়ে উঠবে শিশুবান্ধব। সরকার দেশের শিশুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পাশাপাশি এখন বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোর বিপথগামী শিশুদের উন্নয়নে জাতিসংঘের অধিবেশনে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বাড়ছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেন। তিনি ওই ভাষণে বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোতে বিপদগ্রস্ত শিশুদের সমস্যা তুলে ধরেন। এতে উল্লেখ করেন সাগরে ডুবে যাওয়া সিরিয়ার তিন বছর বয়সি নিষ্পাপ শিশু আইলান কুর্দি ও ৫ বছরের শিশু ওমরান, যে সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে নিজ বাড়িতে বসে বিমান হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তার কথা কী অপরাধ করেছিল এইসব শিশুরা ? প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, একজন মা হিসেবে আমার পক্ষে এসব নিষ্ঠুরতা সহ্য করা কঠিন। বিশ্ব বিবেককে কি এসব ঘটনা নাড়া দেবে না? এভাবে শিশুদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করছেন।

এ বছর বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেছেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হচ্ছে জেনে তিনি আনন্দিত। এই উপলক্ষে তিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিশুরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ রূপকার। আজকের শিশুদের হাতে ন্যস্ত হবে আগামী দিনের নেতৃত্ব। তারা ভবিষ্যতে বিশ্ব পরিচালনার নেতৃত্ব দেবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এজন্য তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা স্নেহ–মমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্ত চিন্তা–চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্বে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ব হয়ে উঠবে সুন্দর ও শান্তিময়। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদনের কোনো বিকল্প নেই। সরকার জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর পাশাপাশি প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' ও 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১'। এসব কর্মসূচি ও নীতিমালা শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে শৈশব থেকেই দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রপতি আশা করেন, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ উদ্‌যাপনে গৃহীত কর্মসূচি শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু স্নেহ-মমতা ও নিরাপদে বেড়ে

উঠুক– এটাই তাঁর প্রত্যাশা। তিনি বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬–এর সাফল্য কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবারের বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য– 'থাকবে শিশু সবার মাঝে ভালো, দেশ সমাজ পরিবারে জ্বলবে আশার আলো' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘে শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ ঘোষণার বহু পূর্বে ১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ শিশু আইন প্রণয়ন করেন। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমাদের সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করছি। পথ শিশু থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুর কল্যাণেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

তিনি বাণীতে বলেছেন, শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতামাতা, পরিবার ও সমাজের সকলের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিককে শিশুর কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্য তিনি সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আজকের শিশুরাই আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দিবে। তাই শিশুদের সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করে তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। তিনি শিশু দিবসের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

অপর দিকে গত ৩ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়ামে শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেড়ে উঠার পথে শিশুদের যাতে বৈষম্যের শিকার হতে না হয়, সেভাবে সমাজকে গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমরা চাই, আমাদের দেশে ধনী, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী যে শিশুই হোক, সবার যেন সমান অধিকার থাকে। কোনো বৈষম্য যেন না থাকে। যেহেতু আমাদের শিশুরাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ, তাদের আমাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাদের যে মেধা তা বিকাশের যেন সুযোগ থাকে। সেই সুযোগটা আমাদের সৃষ্টি করতে হবে।

তিনি প্রতিটি শিশুর জন্য খাবার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেই সমাজ তিনি গড়ে তোলার কথা বলেন যেখানে বৈষম্য বলে কিছু থাকবে না। আপনাদের আশপাশে যারা দরিদ্র শিশু, সেই শিশু কেমন আছে, সে লেখাপড়া করতে পারছে কি-না, পোশাক আছে কি-না বা পেট ভরে খেতে পারছে কি-না– যারা বিত্তবান তারা দয়া করে এই শিশুদের দিকে নজর দিবেন। সেটাই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, কেউ দরিদ্র হয়ে জন্মায় না। ভাগ্যচক্রে কারো দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলে তাকে দারিদ্র্যতা মোকাবিলা করতে হয়। ধনীর ঘরে জন্মালে তা হয় না। কাজেই এই ব্যবধানটা যেন শিশুদের মধ্যে কোনোমতে না দেখা দেয়। প্রতিটি শিশু তার অধিকার যেন নিশ্চিতভাবে পায় সেটা সবাই দেখবেন– এটাই প্রধানমন্ত্রী আশা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধু সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথা স্মরণ করেন। সেইসঙ্গে বর্তমান সরকারের সময়ে নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। ঝরে পড়া রোধ করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। চালু করা হয়েছে মিড-ডে মিল। ধীরে ধীরে সব বই ই-বুক করে দেওয়া হবে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করে দেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকায় আবাসিক স্কুল করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতেও সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রত্যেক উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল থেকে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ করে দিতে প্রতিটি স্কুলে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। একটু সুযোগ সৃষ্টি করলে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো কিছু করতে পারে। আমরা চাই এদেশে কোনো মানুষ দরিদ্র থাকবে না। কোনো শিশু মায়ের কোলে দুঃখে-দুঃখে মারা যাবে না। প্রত্যেকটা মানুষ তার জীবনের অধিকার পাবে। শেখ হাসিনা বলেন, ১৬ কোটি মানুষের খাবার আমরা নিশ্চিত করেছি। তাহলে আমার শিশুরা কেন কষ্ট পাবে, কেন পুষ্টিহীনতায় ভুগবে? সেজন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি। বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এভাবে শিশুদের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। আর তার সুফল শিশুরা ভোগ করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো উজ্জ্বল হয়ে গড়ে উঠবে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে বিশ্ব শিশু দিবস পালন সফল হবে।

*লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট*

নিবন্ধ

# খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশ বর্তমান সরকারের কৃষি খাতে সাফল্য

**মিজানুর রহমান মিথুন**

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে বাংলাদেশ ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছে। কোনো দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে কৃষিতে উন্নয়ন ঘটাতে হয়। বাংলাদেশও এতে পিছিয়ে নেই। বর্তমান সরকারের শাসনামলে কৃষিতে অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বলা যায়, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কোনো সরকার কৃষিতে এখন পর্যন্ত এ অর্জন করতে পারেনি। দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে কমছে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন সমস্ত বিশ্বে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। ধান, গম ও ভুট্টা উৎপাদনে বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নীতি ও বিনিয়োগের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। শাকসবজি ও ফলমূলের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে আলু রপ্তানি এ দেশের কৃষির উল্লেখযোগ্য সাফল্য। বর্তমানে যে উৎপাদন তা দেশের চাহিদা মিটিয়েও রপ্তানি করা হচ্ছে।

কৃষি ব্যাংকের শাখাগুলো কৃষকের ফসলের ওপর সরাসরি ঋণ বিতরণ করায় কৃষক সহজেই কৃষির উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে। বিশেষ করে ট্রাক্টর, ধান মাড়াইয়ের কল, ধান রোপণের আধুনিক যন্ত্রপাতির ওপর বিশেষ ঋণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে অনেক কৃষকই এখন কৃষিতে ভালো করছে। তবে তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও ডালে শতকরা মাত্র ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ায় কৃষক সহজেই আমদানি মুখিতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর তত্ত্বাবধানে স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে পেঁয়াজ, রসুন, ডাল ও তেল আমদানির বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বিশেষ সুবিধার আওতায় এনে কৃষককে স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়ার নির্দেশনা জারি করেছে। এর ফলে কৃষি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকরা গ্রামের মাঠে মাঠে সরাসরি কৃষককে ব্যাংকের ফরম বিতরণের মাধ্যমে ঋণ দিচ্ছেন। এতে একটা সুবিধা হলো কোনো কৃষককেই তাই দালালের মাধ্যমে কমিশন দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে হচ্ছে না। এটা ঋণ বিতরণে কৃষকের জন্য একটা মাইল ফলক।

বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম। স্বাধীনতার পর দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে ধান উৎপাদন হতো ২ টন। এখন উৎপাদন হচ্ছে হেক্টর প্রতি ৪ টনেরও বেশি। স্বাধীনতার পর দেশে ধানের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। বর্তমান সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ এবং পরিশ্রমী কৃষক ও মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসেই এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে দেশের মানুষকে খাওয়ানোর জন্য বাংলাদেশ কোনো চাল আমদানি করেনি। বরং শ্রীলংকায় চাল রপ্তানি শুরু করেছে।

বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সব দিক থেকে বিশ্বের জন্য পথিকৃৎ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ৬৭টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবন করেছে ১৪টি ধানের জাত। আর ১১৫টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলো। এ পর্যন্ত ব্রি ও বিনার বিজ্ঞানীরা মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে লবণ সহিষ্ণু নয়টি, খরা সহিষ্ণু দুটি ও বন্যা সহিষ্ণু চারটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন তারা। এছাড়া বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ পর্যন্ত ২৬টি জাত অবমুক্ত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছে। গত পাঁচ বছরে তারা ছয়টি জাত অবমুক্ত করেছে। আরো দুটি জাত অবমুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। গত বছর বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এতগুলো প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষে। হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। আর মোট ধান উৎপাদনে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাব মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। গত এক যুগে দেশে রীতিমতো সবজি বিপ্লব ঘটে গেছে। এখন দেশে ৬০ ধরনের ও ২০০ জাতের সবজি উৎপাদন হচ্ছে। এসব সবজির ৯০ শতাংশ বীজই দেশে উৎপাদন হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে। এদের প্রায় সবাই কম-বেশি সবজি চাষ করেন। গত এক যুগে দেশে মাথাপিছু সবজির ভোগ বেড়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। পাশাপাশি সবজি রপ্তানি করেও মিলছে বৈদেশিক মুদ্রা। গত এক বছরে শুধু সবজি রপ্তানিতে আয় বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হারে সবজির আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে বাংলাদেশে, বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাবে ১৯৯৪ সালে দেশে মাথাপিছু দৈনিক সবজি খাওয়া বা ভোগের পরিমাণ ছিল ৪২ গ্রাম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) হিসাবে ২০১৪ সালে দেশে মাথাপিছু সবজি ভোগের পরিমাণ ৭০ গ্রাম।

'মাছে ভাতে বাঙালি' সুপ্রাচীন এই কথাটি হারিয়ে গেলেও বর্তমানে তা আবারো বাস্তব হয়ে ধরা দিচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদনের মতে, ২০১৪ সালে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। মাছ উৎপাদনে চীন বিশ্ব সেরা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে যথাক্রমে ভারত ও মিয়ানমার। তারপরই বাংলাদেশের অবস্থান। এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) অর্থনৈতিক শুমারি বলছে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৩৪ লাখ ৫৫ হাজার টন মাছ উৎপাদন হয়েছে। এরমধ্যে চাষ করা মাছের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ লাখ টন। জাটকা সংরক্ষণসহ নানা উদ্যোগের ফলে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাছ ইলিশের উৎপাদন ৫২ হাজার টন বেড়ে সাড়ে ৩ লাখ টন হয়েছে। মাছ রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ১৩৫ গুণ। বাংলাদেশের হিমায়িত মাছ রপ্তানির পরিমাণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪ হাজার ১৪৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বে মোট আম উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায়। আর বাংলাদেশের অবস্থান নবম। কৃষি ও খাদ্য সংস্থার সর্বশেষ মূল্যায়নে প্রতিবেদিত হয়েছে যে, প্রায় সাড়ে ৯ লাখ টন আম উৎপাদনের মাধ্যমে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে উৎপাদন হয় ৮ লাখ ৪২ হাজার আর ২০১০-১১-এ ৮ লাখ ৮৯ হাজার টন। ২০১১-১২ অর্থবছরে তা আরো বেড়ে যায় প্রায় সাড়ে ৯ লাখ টনে। দেশে গড়ে ৩২ হাজার একর জমিতে আমের আবাদ হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের ল্যাংড়া ও আম্রপালি আম। বাংলাদেশ থেকে আম রপ্তানির ব্যাপারে বিশ্বের শীর্ষ পণ্য ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল প্রকিউরমেন্ট লজিস্টিকসের সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেং ফাউন্ডেশন ও এফএওর মধ্যে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এক দশক আগেও বাংলাদেশের আলু উৎপাদন ছিল অর্ধলাখ টনের নিচে। সম্প্রতি এফএও প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে আলুর উৎপাদন ৮২ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন। এ সাফল্য বাংলাদেশকে করেছে আলু উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম। অচিরেই বাংলাদেশের আলু উৎপাদন কোটি টনের দিকে যাবে বলে আশা করা যায়। উৎপাদনে বিস্ময়কর সাফল্যই কেবল নয়, আলু এখন দেশের অন্যতম অর্থকরী ফসলও। গত বছর রাশিয়ায় প্রায় ২৫ হাজার টন আলু রপ্তানি হয়েছে। ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে আলু আমদানির আগ্রহ দেখিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে। অথচ এর আগে বিশ্বের ২০টি দেশ থেকে বাংলাদেশকে আলু আমদানি করতে হতো।

এসব সাফল্যের ফলে বাংলাদেশের কৃষিতে উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মাননা পত্র দিয়ে সম্মান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সফরকারী পরিচালক রোনি কোফিম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পক্ষে ২০ মে, ২০১৫ সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে সম্মাননা পত্রটি হস্তান্তর করেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডেভিড জে স্কোরটন স্বাক্ষরিত সম্মাননা পত্রে বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে, খাদ্য উৎপাদনে স্বাবলম্বিতা অর্জনে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদানকে সমর্থন জানানো হয়।

*লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক*

## রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

# উন্নয়ন যেন মানুষের কল্যাণে লাগে সেদিকে খেয়াল রাখার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, সাধারণ মানুষ যাতে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সোসাইটি অব কার্ডিওভাসকুলার ইন্টারভেনশন (বিএসসিআই)– এর জাতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

*রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রেডিসন ব্লু হোটেলে বাংলাদেশ সোসাইটি অব কার্ডিওভাসকুলার ইন্টারভেনশনের জাতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন –পিআইডি*

তিনি বলেন, উন্নয়ন করলেই হবে না, তা যেন জনগণের কল্যাণে লাগে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, যে উন্নয়ন সাধারণ মানুষের কল্যাণে আসে না বা সামর্থ্যের অভাবে ভোগ করতে পারে না, তা কখনোই সর্বজনীন হতে পারে না। তাই স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন হতে হবে চাহিদাভিত্তিক। জনগণের সামর্থ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এদেশের অনেক মানুষেরই উন্নত সেবা নেওয়ার মতো সামর্থ্য নেই। তাই তাদের জন্য কম খরচে উন্নত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি বলেন, আপনারা অনেক কষ্ট করে ও ত্যাগের বিনিময়ে ডাক্তার হয়েছেন এবং আজকের অবস্থানে পৌঁছেছেন। কিন্তু এ অবস্থানে পৌঁছাতে সাধারণ মানুষের অবদানও কম নয়। তাই সমাজের প্রতি আপনাদের যথেষ্ট দায়বদ্ধতা আছে। তিনি বলেন, সরকারের একার পক্ষে দেশের শতভাগ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে বেসরকারি খাতে বেশ কয়েকটি আধুনিক ও উন্নতমানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব হাসপাতালে সর্বাধুনিক চিকিৎসাও দেওয়া হচ্ছে। এতে চিকিৎসার জন্য বিদেশগামী লোকের সংখ্যা কমে আসছে। তাই আমাদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা মেনে চলা, ধূমপান ত্যাগ করা, কায়িক পরিশ্রম ও নিয়মিত ব্যায়াম করার ওপরও জোর দেন।

হৃদরোগের চিকিৎসায় ওষুধ ও প্রযুক্তির পাশাপাশি রোগের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কেও জানা অত্যন্ত জরুরি এবং এর কারণ, প্রতিরোধের উপায় ও কৌশল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করা গেলে এ রোগের প্রকোপ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি।

এছাড়া তিনি প্রতি সপ্তাহে বা মাসে অন্তত একদিন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা দিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

## প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

# যুবসমাজকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ সেপ্টেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দেশসেরা ক্রীড়াবিদদের মাঝে ২০১০, ১১ ও ১২ সালের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখার আহ্বান জানান। যুবসমাজকে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারলে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং নতুন নতুন ভেন্যু তৈরি ও খেলাধুলার উন্নয়নে ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক অনুদান প্রদান করার কথাও উল্লেখ করেন।

### দেশীয় মেসেজিং অ্যাপ 'আলাপন' উদ্‌বোধন

গোপনীয়তা রক্ষা করে সরকারি কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও ফাইল আদান-প্রদানে দেশীয় মেসেজিং অ্যাপ 'আলাপন' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইওএস এবং গুগল প্লেস্টোরে অ্যাপটি অবমুক্ত করা হয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে সরকারের যে-কোনো কর্মকর্তা যে-কোনো জায়গা থেকে একক বা গোষ্ঠীগত চ্যাটিং, ভয়েজ ও ভিডিও কল, গ্রুপ কনফারেন্স ছাড়াও নথি আদান-প্রদান করতে পারবেন এবং সেইসঙ্গে কর্মকর্তাদের অবস্থানও জানা যাবে।

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সাকিব আল হাসানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন –পিআইডি*

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি*

### একনেক সভায় সাত প্রকল্প অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ সেপ্টেম্বর শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কসহ মোট সাত প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

### ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ সেপ্টেম্বর চিলমারীর থানাহাট এইউ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ' শীর্ষক স্লোগান নিয়ে এই পল্লি রেশনিং কার্যক্রমের আওতায় সারা দেশের ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশের একটা মানুষও কষ্টে থাকবে না, একটা মানুষও না খেয়ে থাকবে না। পরে তিনি সম্প্রসারিত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চিলমারীবাসীকে সরকারি উদ্যোগে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দিতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

### দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ সেপ্টেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী দেশকে শতভাগ নিরক্ষরমুক্ত করতে ছাত্রনেতাসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

### কানাডায় ফিফথ গ্লোবাল ফান্ড রিপ্লেনিসমেন্ট কনফারেন্স- এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ সেপ্টেম্বর কানাডায় জিএফ সম্মেলন এবং যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের ৭১তম অধিবেশনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি প্রথমে লন্ডন যান। লন্ডনের হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে বাংলাদেশের হাইকমিশনার তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তাঁকে লন্ডনের স্টোক পার্ক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাংলাদেশের প্রবাসীরা তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি সেখানে ২২ ঘণ্টা অবস্থান করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি কানাডার বিমানে কানাডার মন্ট্রিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিমানটি রাতে মন্ট্রিলের পিয়েরে এলিয়ট ট্রুডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কানাডার কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী এবং অটোয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মিজানুর রহমান তাঁকে স্বাগত জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রীকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় মন্ট্রিলের হোটেল ওমনি মন্ট রয়্যাল-এ। সফরকালে তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তিনি কানাডার মন্ট্রিয়েলে অনুষ্ঠিত ফিফথ গ্লোবাল ফান্ড (জিএফ) রিপ্লেনিসমেন্ট কনফারেন্সের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক তিন ব্যাধি–এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে একত্রে কাজ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। এজন্য প্রয়োজন অঙ্গীকার, সংকল্প ও সংহতি। তিনি দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে তাঁর সরকারের প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক তহবিলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেলের যৌথ আমন্ত্রণে আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন এবং সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কানাডা শাখা আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে সেন্টার মন্ট রয়্যালে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর খুনি অভিযুক্ত অপরাধীদের প্রত্যর্পণের ব্যাপারে জনমত তৈরির জন্য কানাডার প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানান।

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মন্ট্রিলে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ইলিয়ট ট্রুডো'র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য বাঙালি জাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর পুত্র ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো'র হাতে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করেন –পিআইডি*

## জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে যোগ দিতে কানাডা থেকে নিউইয়র্কে যান। তিনি নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দর পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা। স্বাগত জানানোর পর মোটর শোভাযাত্রা সহকারে প্রধানমন্ত্রীকে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে হোটেল ওয়াল্ডোর্ফ এস্টোরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। অধিবেশন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী এই হোটেলেই অবস্থান করেন। তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় অভিবাসী ও শরণার্থীদের সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্বকে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অং সান সূচির সঙ্গে বৈঠক করেন। ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবতার স্বার্থে বিশ্ব থেকে সংঘাত দূর করে শান্তির পথে এগিয়ে যেতে এক মঞ্চে উপনীত হতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি নারীদের জন্য টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণ এবং সহিংস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত রাখতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন'-এর স্বীকৃতি দেয় এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম। এ সম্মাননাকে বাংলাদেশের নারীদের জন্য সত্যিকার পরিবর্তনের স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইড লাইনে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইনক্লুসিভ গ্রোথ বিষয়ক সোসাল ডায়ালগ সংক্রান্ত গ্লোবাল ডিলের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ, ন্যায্যমূল্য ও উন্নয়ন অর্থায়নের সুযোগদানের ক্ষেত্রে দেওয়া অঙ্গীকার রক্ষায় বিশ্বের স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পানি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী পানিকে নতুন উন্নয়ন কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে আন্তঃসীমান্ত জলাধারের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরেন।

## স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ অক্টোবর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদকে স্মার্ট কার্ড প্রদানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ এই স্মার্ট কার্ড রাষ্ট্রপতিকে পৌঁছে দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের কার্ডটি বুঝে নেন এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যদের হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নাগরিক তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। স্মার্ট কার্ড নকল করা সহজ হবে না আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্মার্ট কার্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ অক্টোবর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন শেষে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেন –পিআইডি*

## দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এসডিজি পূরণের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ অক্টোবর তাঁর কার্যালয়ে জাতীয় দক্ষতা ও উন্নয়ন কাউন্সিলের সভার উদ্‌বোধন করেন। সভা উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়াই তাঁর সরকারের লক্ষ্য এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য কী করে আমরা বাস্তবায়ন করব– সেটাই আমাদের সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এলক্ষ্যে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এসডিজি) পূরণে সংশ্লিষ্টদের কাজ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের করণীয়, কৌশল ও পরিকল্পনাগুলো চিন্তা করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

## শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ অক্টোবর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌বোধন উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের স্থান হবে না এবং ধর্মের নামে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আমরা বরদাশত করব না। তিনি বলেন, 'আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম-মুক্তিযুদ্ধে প্রতিটি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ এক হয়ে যুদ্ধ করে এদেশকে স্বাধীন করেছে। সবার রক্ত একাকার হয়ে মিশে গেছে এদেশের মাটিতে। মুসলিম-হিন্দু-খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ সবাই এদেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে। তাই সব ধর্মের মানুষ এদেশে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করবে। যার যার ধর্ম সম্মানের সাথে পালন করবে, একজন অন্যজনের ধর্মের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে। সুন্দরভাবে মানুষ বাঁচবে, উন্নত জীবন পাবে– সেটাই আমি আশা করি।' **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

## তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

# বঙ্গবন্ধুর জীবন ও ইতিহাস চর্চার বিকল্প নেই

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধনকালে বলেন, বাংলাদেশকে তার নিজের পথে রাখতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও ইতিহাস চর্চার বিকল্প নেই। আর ইতিহাস থেকে সংগৃহীত এ আলোকচিত্র প্রদর্শনী ইতিহাস চর্চারই অংশ।

তিনি আরো বলেন, একাত্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর তাদের মনগড়া ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। ১৯৭৫ সালেও ঘাতকরা পাকিস্তানি ধারার ব্যবস্থা চাপানোর চেষ্টা করেছিল তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

*তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক সপ্তাহব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি*

### বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য কাজ করবে সরকার

তথ্যমন্ত্রী ২৮ আগস্ট কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার চরগোপালনগর, ঢাকাচর ও জুনিয়াদহ এলাকাসহ পদ্মা নদীর পাড়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রানসামগ্রী বিতরণ করেন। ত্রাণসামগ্রী বিতরণ শেষে মন্ত্রী বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য সরকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করবে, স্থানীয় প্রশাসনকে বলা হয়েছে পরিকল্পনা দেওয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রী ও ত্রাণমন্ত্রীর তদারকিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সেইসাথে কৃষি ও গবাদিপশুর যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে তালিকা করা হচ্ছে।

### শান্তির জন্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ

মন্ত্রী ৩০ আগস্ট রাজধানীর এক হোটেলে দৈনিক পত্রিকা *দ্য এশিয়ান এইজ* আয়োজিত 'শান্তির জন্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বিষয়ে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিমুক্ত সমাজ গড়তে দুই কৌশল নিতে হবে– জঙ্গিদের ধ্বংস করা এবং তাদের দোসরদের একঘরে করে বর্জন করা।

মন্ত্রী আরো বলেন, জঙ্গি লেবেল এঁটে কোনো নিরপরাধী হত্যা করা হচ্ছে না। যারা জঙ্গিদের নিরপরাধ বলে চালানোর চেষ্টা করছে, তারাই জঙ্গিদের দোসর। আর জঙ্গি দোসররা গণতন্ত্রের লেবেল এঁটে নিজেদেরকে রাজনীতির মাঠে হালাল করতে চায়। সে কারণে জঙ্গি পুনঃউৎপাদন বন্ধ করা ও স্থায়ী শান্তির জন্য জঙ্গি ও তাদের দোসর উভয়কেই নির্মূল করতে হবে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

## আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

# গেরিলা বাহিনীর ২৩৬৭ জনকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে গঠিত বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ২ হাজার ৩৬৭ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

৮ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত রিট আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

আইনজীবী তবারক হোসেন বলেন, তিনটি সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ২ হাজার ৩৬৭ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও যথাযথ সম্মান দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

### চুকনগর গণহত্যা দিবসে ১০ হাজার মোমবাতি প্রজ্বলন

২০ মে বেদনাবিধূর চুকনগর গণহত্যা দিবস। ১৯৭১-এর এই দিনে খুলনার চুকনগরে ঘটে নারকীয় হত্যাকাণ্ড। চুকনগর ছিল প্রকৃতপক্ষে পলায়নপর মানুষের ট্রানজিট। খুলনা-যশোর-সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তবর্তী ভদ্রা নদীর কোলঘেঁষা চুকনগরেই হাজার হাজার পরিবার মে মাসের ১৯ তারিখে রাত কাটায়। পরদিন (২০ মে) সকালে ঘটে নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞ।

খুলনা জেলার তৎকালীন ডুমুরিয়া থানাধীন এই চুকনগরেই পরদিন ২০ মে ঘটেছিল সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে একক বৃহত্তম নর হত্যাযজ্ঞ। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ শুরু হওয়া এই বর্বরতম হত্যাকাণ্ডটি ঘটে

প্রায় সন্ধ্যা অবধি। গুলি-বেয়নেটের আঘাত ও নদীপথে নৌকাযোগে পলায়নরত নরনারী ও শিশুর সলিল সমাধি হয়েছে তার সঠিক হিসাব কেউ বলতে পারে না।

একাত্তরের ২০ মে চুকনগরের গণহত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা আজও সেই যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছেন। স্বজন হারানোর ব্যথা তাঁদের বুকেই চেপে আছে। এই দিনটি এলে তাঁরা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। ঘৃণায় বুক কেঁদে ওঠে। পাকি হায়েনাদের গালি দেন।

জানা যায়, বটিয়াঘাটা, দাকোপ, বাগেরহাট, পিরোজপুর, মংলা, মোড়েলগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রাণভয়ে পালানো ভীতসন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেশিরভাগ নদীপথে নৌকাযোগে, কেউ সড়কপথে ছুটছিল ভারতের দিকে। এ কারণে এখানকার হত্যাযজ্ঞে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরাই শহিদি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। সেদিনের চুকনগর আজকের চুকনগর থেকে অনেক পার্থক্য। তখন তিনদিকে ছিল নদী। নদীপথে আসা মানুষেরা এখানকার পাতাখোলা বিলসহ গোটা এলাকায় বিশ্রাম নেয়। নদীর পাশে ছিল মন্দির। তার পাশে ছিল বিশাল বটগাছ। পাশে বাজার। গোটা এলাকা জুড়েই ছিল মানুষ।

পাকি সেনাদের ওপর তেড়ে যাওয়া চুকনগরের চিকন মোড়লকে হত্যা দিয়ে এখানকার হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়।

সেই সময়ের কিশোর প্রত্যক্ষদর্শীগণের বক্তব্য অনুযায়ী, চুকনগরের গণহত্যায় শহিদের সংখ্যা দশ হাজারের কম নয়, বরং বেশি বলে মনে করেন।

চুকনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ও সেখানে হাড়গোড় পাওয়া গেছে। চুকনগর গণহত্যা স্থলে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে এবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেদিন সন্ধ্যায় গণহত্যার শিকার নারী, পুরুষ, শিশুদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভে ১০ হাজার মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়েছে। এছাড়া আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। **প্রতিবেদন : আসিফ রহমান**

## সীমান্ত ব্যাংক উদ্‌বোধন

১ সেপ্টেম্বর : বিজিবি'র সদর দপ্তর পিলখানায় 'সীমান্ত ব্যাংক'–এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

### জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৪ সেপ্টেম্বর : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালের জাতীয় ক্রীড়া পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে যুবসমাজকে ফিরিয়ে আনতে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন

### অ্যাপ উদ্‌বোধন

৫ সেপ্টেম্বর : গোপনীয়তা রক্ষা করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও ফাইল আদান–প্রদানে

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য দেশীয় মেসেজিং অ্যাপ 'আলাপন'–এর উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি*

দেশীয় ম্যাসেজিং অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) 'আলাপন' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এটি উদ্‌বোধন করেন

### একনেক বৈঠক

৬ সেপ্টেম্বর : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কসহ মোট সাতটি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে

### ১০ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ উদ্‌বোধন

৭ সেপ্টেম্বর : কুড়িগ্রামের চিলমারী থানাহাট এইউ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

### আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত

৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল–'অতীতকে জানব, আগামীকে গড়ব'

### সাক্ষরতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৬'–এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে শতভাগ নিরক্ষরমুক্ত করতে ছাত্রনেতাসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান

### বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস

'বয়সের সঙ্গে জীবন জুড়ে দিন'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হয় 'বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস'

### পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত

১৩ সেপ্টেম্বর : মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় পশু কোরবানির মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হয় মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা

### শুভ মধু পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত

১৫ সেপ্টেম্বর : যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শুভ মধু পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়

### আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস

১৬ সেপ্টেম্বর : অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস'

### প্রাণঘাতী রোগ নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ হোন – প্রধানমন্ত্রী

কানাডার মন্ট্রিলে গ্লোবাল ফান্ড (জিএফ) সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার মতো প্রাণঘাতী রোগ নির্মূলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান

*রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কেআইবি কমপ্লেক্স চত্বরে '৫ম জাতীয় কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক কৃষি সম্মেলন'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি*

### মহান শিক্ষা দিবস পালিত

১৭ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'মহান শিক্ষা দিবস'

### জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী

১৯ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অভিবাসী ও শরণার্থীদের সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্বকে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে

### জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

২১ সেপ্টেম্বর : নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবতার স্বার্থে বিশ্ব থেকে সংঘাত দূর করে শান্তির পথে এগিয়ে যেতে এক মঞ্চে উপনীত হতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান

### দুই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেন প্রধানমন্ত্রী

নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য নিউইয়র্কে ইউএন ওমেন ও গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'প্লানেট ফিফটি-ফিফটি চ্যাম্পিয়ন'– এর স্বীকৃতি দেয় এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে

### বিশ্ব মীনা দিবস পালিত

২৪ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব মীনা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল–'মানসম্মত শিক্ষা পেলে শিশুবিবাহ ও শিশুশ্রম রোধ হবে'

### জাতীয় নাট্যোৎসব

শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার প্রধান মিলনায়তনে ১৮ দিনব্যাপী 'জাতীয় নাট্যোৎসব' উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। এ উৎসবের এবারের স্লোগান ছিল– 'এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের, এ মাটি মানবতার'

### বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্‌যাপন

২৭ সেপ্টেম্বর : 'সকলের জন্য পর্যটন সার্বজনীন পর্যটনের অভিগম্যতা'– প্রতিপাদ্য নিয়ে সারাবিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব পর্যটন দিবস'

### আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস

২৮ সেপ্টেম্বর : তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'তথ্য পেলে মুক্তি মেলে, সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে'

### বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'জলাতঙ্ক : জানতে হবে, টিকা নিতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে'

### কৃষকদের দক্ষ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

২৯ সেপ্টেম্বর : কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)-এর পঞ্চম জাতীয় কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক কৃষি সম্মেলনে বক্তৃতাকালে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাওয়াতে কৃষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে কৃষিবিদসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

### বিশ্ব হার্ট দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব হার্ট দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সুস্থ হার্ট প্রাণবন্ত জীবন'

### জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপিত

৩০ সেপ্টেম্বর : 'শিশু কন্যার বিয়ে বন্ধ করি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ি'– এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৬' উদ্‌যাপিত হয়

### উষ্ণ অভ্যর্থনায় সিক্ত প্রধানমন্ত্রী

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে বিপুল গণ-অভ্যর্থনায় সিক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘে দুটি সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করায় প্রধানমন্ত্রীকে এ অভ্যর্থনা দেওয়া হয়।

**প্রতিবেদন : আখতার শামীমা হক**

## উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

# বাংলাদেশ দারিদ্র্য জয় করল

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ অনুকরণীয় মডেল। এক সময়ের তলাবিহীন ঝুড়ি আজ পেয়েছে দারিদ্র্যমুক্ত হওয়ার স্বীকৃতি। বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগ আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশ দারিদ্র্য জয়ের বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে হতদরিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে অতিদরিদ্র ২ কোটি ৮০ লাখ। ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে যাদের দৈনিক আয় ১.৯০ ডলার বা ১৪৮ টাকার কম তারা অতিদরিদ্র। কোনো দেশের দারিদ্র্যের হার বলতে সে দেশের অতিদরিদ্রকে বোঝায়। বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ উন্নয়ন আপডেট' প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রতিফলিত হয়েছে। অতিদরিদ্রের হার কমিয়ে আনতে বাংলাদেশের অর্জন অবিস্মরণীয়। এক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তান ও ভুটানের মতো দেশকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। ২০০৫ সালে ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তি ছিল ১.২৫ ডলার বা ৯৮ টাকা। গত বছর থেকে এই মানদণ্ড হয়েছে ১.৯০ ডলার বা ১৪৮ টাকা। নতুন এই ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ পেল বিশ্ব স্বীকৃতি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা, সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতির কারণে এ সাফল্য এসেছে।

### অবসর ভাতা বৃদ্ধির বিল পাস

অবসরে যাওয়া রাষ্ট্রপতির ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন-২০১৬ পাস করা হয়েছে। এ বিলের বিধান অনুযায়ী বর্তমানে রাষ্ট্রপতি অবসরে গেলে মাসে ৪৫ হাজার ৯০০ টাকা ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তবে সর্বোচ্চ আদালত ঘোষিত অবৈধ রাষ্ট্রপতিরা এ সুবিধা পাবেন না।

### ইলিশ ধরতে নিষেধাজ্ঞা

ইলিশ মাছের স্বাদে এবার মন ভরেছে সবার। চলতি মৌসুমে ব্যাপক হারে ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। কিন্তু মাছের প্রজননের স্বার্থে ইলিশ ধরা ও বিক্রির অবারিত সুযোগ বন্ধ হচ্ছে ১২ অক্টোবর থেকে। চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। আসন্ন প্রজনন সময়ে ২৭ জেলায় মা ইলিশ শিকারের ওপর ২২ দিনের এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার।

### স্মার্ট কার্ডের সেবা

বাংলাদেশের নাগরিকদের বহু প্রতীক্ষিত উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) বিতরণ শুরু হয়েছে। এবারের স্মার্ট কার্ডে থাকা ব্যক্তির নাম (বাংলা ও ইংরেজি) পিতা/মাতার নাম, জন্মতারিখ ও জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন নম্বর দৃশ্যমান থাকবে। কার্ডের পেছনে থাকবে ব্যক্তির ভোটার এলাকার ঠিকানা, রক্তের গ্রুপ ও জন্মস্থান। সব মিলিয়ে স্মার্ট কার্ডের মধ্যে থাকা চিপ বা তথ্য ভাণ্ডারে ৩২ ধরনের তথ্য থাকবে। যা মেশিনে পাঠযোগ্য হবে। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও চা-পাতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ও বর্তমান জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে স্মার্ট কার্ডে। স্মার্ট কার্ডে তিন স্তরে মোট ২৫টি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংযোজিত রয়েছে যেখানে প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো খালি চোখে দৃশ্যমান হবে। দ্বিতীয় স্তরের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলো দেখার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। তৃতীয় স্তরের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেখতে ল্যাবরেটরিতে ফরেনসিক টেস্টের প্রয়োজন হবে। ২২ ধরনের সেবার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র কাজে লাগবে। আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর পাওয়া, শেয়ার আবেদন ও

বিও হিসাব খোলা, ড্রাইভিং লাইসেন্স করা ও নবায়ন, ট্রেড লাইসেন্স করা, পাসপোর্ট করা ও নবায়ন, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন, চাকরির আবেদন, বিমা স্কিমে অংশগ্রহণ, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রেশন, ব্যাংক হিসাব খোলা, নির্বাচনে ভোটার শনাক্তকরণ, ব্যাংক ঋণ, গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের সংযোগ, সরকারি বিভিন্ন ভাতা উত্তোলন, টেলিফোন ও মোবাইলের সংযোগ, সরকারি ভর্তুকি, সাহায্য ও সহায়তা, ই-টিকেটিং, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, আসামি ও অপরাধী শনাক্তকরণ, বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর পাওয়া ও সিকিউরড ওয়েব লগে ইন করার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর লাগবে। তবে আইনগতভাবে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়ের নম্বর এখনো বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

**প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

## নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

# 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' পেলেন প্রধানমন্ত্রী

নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম। ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ প্লাজায় এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার হাতে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ

*নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কে UN-Women এবং Global Partnership Forum প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Planet 50-50 Champion'-এর স্বীকৃতি দেয় এবং 'Agent of Change Award' প্রদান করে –পিআইডি*

অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেওয়া হয়। এ পুরস্কার পাওয়ার মধ্যদিয়ে প্রধানমন্ত্রী 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে জাতিসংঘ উইমেনের স্বীকৃতি পেলেন।

এই সম্মাননাকে বাংলাদেশের নারীদের জন্য সত্যিকার পরিবর্তনের স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন দেখি, যেখানে সবাই নারীকে সম্মান জানাবে। যেখানে নারীর বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার সহিংসতা ও বৈষম্য থাকবে না।'

**প্রভাবশালীর তালিকায় রুশনারা টিউলিপ**

যুক্তরাজ্যের *ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত সহস্র প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লেবার দলীয় এমপি টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক ও রুশনারা আলী। সম্প্রতি প্রকাশিত এ তালিকায় যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখা লন্ডনের এক হাজার প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত এ তালিকায় হ্যাম্পসিড ও কিলবার্নের এমপি টিউলিপ এবং বেথনাল গ্রিন ও বো'র এমপি রুশনারা স্থান পেয়েছেন ওয়েস্টমিনিস্টার শ্রেণিতে। তাদেরকে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে *ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকা লিখেছে, সিরীয় শরণার্থীদের জন্য আরো কিছু করতে যুক্তরাজ্যের প্রতি আহ্বান জানানোয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন টিউলিপ। আর রুশনারা ইরাকে বিমান হামলার ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকার পর তিনি শিক্ষা ও যুব বিষয়ক ছায়ামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

**অনন্যা সম্মাননা পেলেন ১১ জন নারী**

নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১০টি বিভাগে ১১ জন নারীকে দেওয়া হয়েছে 'অনন্যা শীর্ষ দশ ২০১৫' সম্মাননা। সম্প্রতি রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে পাক্ষিক *অনন্যা*

আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদেরকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

এ বছর পর্বতারোহণের জন্য ওয়াসফিয়া নাজরীন, প্রযুক্তি খাতে সোনিয়া কবির বশির, সাংগঠনিক দক্ষতায় লুভা নাহিদ চৌধুরী, উদ্যোক্তায় মালিহা এম কাদির, সাংবাদিকতায় সুপ্রীতি ধর, সমাজকর্মে সাহিদা আক্তার স্বর্ণা, শিক্ষায় উম্মে তানজিলা চৌধুরী মুনিয়া, চলচ্চিত্রে অপর্ণা ঘোষ, সংগীতে অণিমা মুক্ত গোমেজ এবং খেলাধুলায় যৌথভাবে এসএ গেমসে ভারোত্তোলনে স্বর্ণপদক বিজয়ী মাবিয়া আক্তার ও সাঁতারে স্বর্ণপদক বিজয়ী মাহফুজা খাতুন শিলা এ সম্মাননা পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য নারীদের এই সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

**জাতিসংঘ সম্মাননা পেলেন ডা. নাজমা**

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আইভরিকোস্টে দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব এবং জাতিসংঘকে সহায়তার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন মেডিকেল কন্টিজেন্টের নারী কমান্ডার কর্নেল ডা. নাজমা বেগম। এছাড়া জাতিসংঘ থেকে ২০১৬ সালের জন্য 'মিলিটারি জেন্ডার অ্যাডভোকেট অব দ্য ইয়ার' পুরস্কারের জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠানে কর্নেল ডা. নাজমা বেগম এবং তার দলকে বিশেষ সম্মাননা জানিয়ে হাতে সম্মাননা তুলে দেন জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি এমবাই বাবাকার সিসি।

জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম একটি মেডিকেল কন্টিজেন্টের নারী কমান্ডার হিসেবে গত বছর আইভরিকোস্টে যান কর্নেল নাজমা। ৫৬ সদস্যের মেডিকেল কন্টিজেন্টে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। কর্নেল নাজমা বেগমের দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্বের জন্য এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ না করে জাতিসংঘকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানায় জাতিসংঘ।

**নারী শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন**

বাংলাদেশে নারীদের শিক্ষার বিষয়ে প্রায় প্রতিটি পরিবারে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও নারীদের চাকরির ক্ষেত্রে ধর্ম তেমন কোনো প্রভাব ফেলছে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এ অনুষ্ঠিত এক গবেষণা জরিপে এসব তথ্য উঠে আসে।

পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর করা এক গবেষণার ওপর এ সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণার তথ্য থেকে জানা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। এদেশগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য কাজ করছে। নারীর কর্মসংস্থানের কারণে পরিবারগুলোতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য যোগ হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ১১১টি পরিবারের ৩০৭ জন সদস্য ও স্বতন্ত্র ৩ হাজার নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে।

**নারীদের জন্য ভারতীয় ভিসা**

ই-টোকেন ও পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের সময়সূচি ছাড়াই নারী পর্যটকদের জন্য ভিসা চালু করেছে ভারত সরকার। সম্প্রতি ভারতীয় হাইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে ভারতীয় হাইকমিশন ই-টোকেন ছাড়া ভারত ভ্রমণে আগ্রহী নারীদের জন্য ভিসা দেওয়ার কর্মসূচি ৩ অক্টোবর থেকে শুরু করেছে। আবেদনের সময় নারী আবেদনকারী ও তার পরিবারের সদস্য এবং ভিসা প্রার্থীদের নিশ্চিত বিমান টিকিট থাকতে হবে।

**প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

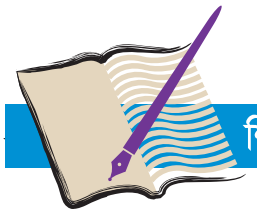

## শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

# টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ১ অক্টোবর শেরেবাংলা নগরে এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে 'মীনা দিবস ২০১৬' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, মীনা একটি জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র। এ চরিত্র সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ বৈষম্য ও শিশু অধিকার বিষয়ে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড পরিহারের জন্য সমাজের সবাইকে উৎসাহিত করে, অসম খাদ্য বণ্টন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে এবং শিশুকে বিদ্যালয়ে আসতে সচেতন ও উৎসাহিত করে থাকে। এর মাধ্যমে সবার মাঝে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি

*শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৪ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা কলেজে 'জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে ক্লাস শুরু'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন –পিআইডি*

হয়। তিনি আরো বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই। একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়তে হলে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। আর তা হবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

**শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত দিয়ে কার্যক্রম শুরু বাধ্যতামূলক**

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৪ অক্টোবর ঢাকা কলেজে দৈনন্দিন শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর আগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করবে–এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক, যৌন হয়রানিসহ সব অপশক্তি থেকে দূরে রাখতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চেতনায় উজ্জীবিত করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করতে জাতীয় দিবসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ না রেখে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করার বিষয়ে নির্দেশ দেন।

**প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

## প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

# অটিজম সচেতনতা তৈরি হউক সকলের মাঝে

সমাজ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, কারো সাথে যোগাযোগ করতে না পারা এবং নিজের কথা বলতে না পারা– এগুলো অটিজম রোগের লক্ষণ। বলা হয়, অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা নিজেদের একটি আলাদা জগৎ তৈরি করে নেয়–যেখানে সবার যাতায়াত থাকে না। যোগাযোগ করার ক্ষমতা থাকে না বলে অটিজমে আক্রান্ত বাচ্চাদের একরকম আলাদা করেই রাখা হয়।

অটিজম অটিস্টিক ডিজঅর্ডার নামেও পরিচিত। অটিজম হচ্ছে স্নায়ু বা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও পরিবর্ধনজনিত অস্বাভাবিকতা, যার কারণে আক্রান্ত শিশুর সামাজিকভাবে বেড়ে উঠতে অসুবিধা হয়। অটিজমের কারণে কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। শিশুর বয়স ৩ বছরের পূর্বেই এই রোগের লক্ষণগুলো দেখা যায়। অটিজম স্নায়ুকোষ এবং স্নায়ুকোষের সংযোগস্থলের গঠন এবং বিন্যাসের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, ফলে তথ্য আদান-প্রদান ব্যাহত হয়। অটিজম সচেতনতা বাড়াতে অটিজমের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা জরুরি।

অটিজম দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো স্পেকট্রাম ডিজওর্ডার (Autism Spectrem), অন্যটি হলো অ্যাস্পারজার সিন্ড্রোম (Asperger syndrome)। এক্ষেত্রে শিশুর মানসিক ও ভাষার ওপর দক্ষতা কম থাকে। যখন অ্যাস্পারজার সিন্ড্রোম ও অটিজমের কোনো বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায় না তখন ধরে নেওয়া হয় PDD-NOS (pervasive developmental disorder, not otherwise specified) থাকতে পারে।

অটিজমের কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। এই রোগের জটিলতা, লক্ষণ এবং তীব্রতার ওপর নির্ভর করে এর কারণগুলো ভিন্ন হতে পারে। পরিবেশগত, বংশগত ও জিনগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। অটিজমের কারণ সম্পর্কে যথাযথ জানা অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর উপায়।

বংশগত ও জিনগত কারণ (Genetic Problems): বিভিন্ন জিনের কারণে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার হয়ে থাকে। কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে জেনেটিক ডিজঅর্ডার যেমন রেট সিন্ড্রোম (নবজাতকের মস্তিষ্কের স্নায়ুগত সমস্যা) বা ফ্র্যাজাইল এক্স সিন্ড্রোমের সাথে এই রোগটি হয়ে থাকে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই জিনগত কারণে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা এবং পরিবেশগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। আর অন্যান্য জিনগুলো মস্তিষ্কের কোষগুলোর পরিবহণ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করে এবং এই রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। কিছু জেনেটিক বা জিনগত সমস্যা বংশগত হতে পারে আবার কোনো কারণ ছাড়াই এই রোগটি

হতে পারে। অটিজম সচেতনতা না থাকার কারণে আমরা প্রায়শই বংশগত কারণগুলো এড়িয়ে যাই।

পরিবেশগত কারণ (Environmental Factors): বিজ্ঞানীদের মতে, ভাইরাল ইনফেকশন, গর্ভকালীন জটিলতা এবং যেসব উপাদান বায়ু দূষিত করে এসব অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার হওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

আর ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধকের সাথে এই রোগ হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

সঠিকভাবে অটিজমের লক্ষণগুলো জানার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। চিকিৎসকরা এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণত যেসব লক্ষণগুলো দেখতে পান সেগুলো হলো– খিঁচুনি, বিষণ্নতা, ক্ষিপ্র ব্যবহার, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির অভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, খিটখিটে মেজাজ, অসামাজিক আচরণ, কথা বলতে সমস্যা হওয়া, অস্থিরতা, আসক্তি, দীর্ঘকালীন মাসিক, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়া ইত্যাদি।

**যে কারণে অটিজমের ঝুঁকি বাড়ে**

যেসব বিষয়ের কারণে অটিজম স্পেকট্রম ডিজঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় সেগুলো হলো :

**বাচ্চার লিঙ্গ**

মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ৪ গুণ বেশি থাকে।

**পারিবারিক সূত্রে**

বাবা-মা, ভাই-বোনের অটিজম থাকলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

**অপরিণত অবস্থায় নবজাতকের জন্ম**

যেসব নবজাতক ২৬ সপ্তাহের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করে তাদের এই রোগের ঝুঁকি বেশি থাকে।

**অটিজম কীভাবে ব্রেইনের ওপর প্রভাব ফেলে?**

অটিজম হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণের সমষ্টি। এই রোগ ঠিক কীভাবে ব্রেইনের ওপরে প্রভাব ফেলে তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

**অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?**

প্রায় ১৫০ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশুর এই রোগ হতে পারে। এই রোগের ব্যাপ্তি অনেক।

**অটিজম প্রতিরোধে করণীয়**

অটিজম প্রতিরোধে সর্বপ্রথম অটিজম সচেতনতা বাড়াতে হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত উপায়ে অটিজম মোকাবিলা করা সম্ভব।

শিশুদের মধ্যে সামাজিক ও ভাষাগত দক্ষতা আনয়নের উদ্দেশ্যে থেরাপিস্টরা একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষা বা ট্রেইনিং দিয়ে থাকেন। এছাড়াও অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের সাথে যেন খাপ খাইয়ে থাকতে পারে সেজন্য পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদেরও কাউন্সেলিং করা যেতে পারে।

উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা এবং অতিরিক্ত আসক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে ডাক্তার অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারেন। আচরণগত সমস্যার চিকিৎসায় অ্যান্টি-সাইকোটিক ধরনের ঔষধ দেওয়া যায়। খিঁচুনি প্রতিরোধক হিসেবে অ্যান্টি-কনভালসেন্ট ঔষধ গ্রহণ করা যায়। যাদের মনোযোগের অভাব থাকে তাদের মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য স্টিমুল্যান্ট জাতীয় ঔষধের পরামর্শ দেওয়া যায়।

অটিজম মোকাবিলায় বেশকিছু থেরাপিও দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এসব থেরাপি প্রয়োগের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। **প্রতিবেদন : আফরোজা আক্তার**

**জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন**

## নারীর মানবাধিকার ও তথ্য অধিকার আইন

বাংলাদেশ লিঙ্গীয় সমতা আনয়নে ইতিবাচক দৃঢ় পদক্ষেপ রাখছে, যাতে করে অধস্তন অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি হয় এবং রাষ্ট্রের মূলধারার সকল কর্মকাণ্ডে তাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের দৃঢ়বদ্ধ সদিচ্ছার প্রতিফলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। যেমন– নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় একের পর এক আইনকানুন, প্রবিধান প্রণয়ন, নারী শিক্ষায় অনুপ্রেরণা প্রদান এবং সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণ, নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন এবং নীতিমালার আলোকে কর্মসূচি নির্ধারণ, কর্মকাণ্ড পরিচালনা, বৃদ্ধকালীন ও বিধবা ভাতা প্রদান, ট্রাইবাল নৃগোষ্ঠীভুক্ত নারীদের জন্য বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ, স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা সৃজন, আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন জেলায় মহিলা সমিতি স্থাপন, নারীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা, উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপজেলায় 'মহিলা সিভিল

সার্ভেন্ট অফিসার' নিয়োগ। নারীর সমস্যা আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রবণ মামলা গ্রহণ (যারা আগ্রাসন, মাস্তানি ও অন্যায়ের শিকার হয়েছেন) ইত্যাদির জন্য বেশ কয়েকটি থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ নিয়োগ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে এগোতে চলেছে। ১৬০ মিলিয়ন বিশাল সংখ্যক জনগণ অধ্যুষিত ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী এর ভৌগোলিক মানচিত্র। জনগণের ৪৯% নারী-পুরুষ শাসিত সমাজে বিরাজমান থাকায় এদেশের নারীরা কিছুটা অবদমিত। সরকার তাই নিয়েছে নানা পদক্ষেপ। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ আজ সময়ের দাবি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাংলাদেশও বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। তাই নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ লিঙ্গীয় সমতা আনয়নে ইতিবাচক দৃঢ় পদক্ষেপ রাখছে। রাষ্ট্রের মূলধারার সকল কর্মকাণ্ড নারীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। নারী মুক্তির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সরকার নারীদের জন্য বিভিন্ন আইন ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এখন প্রশ্ন নারীরা এই আইন সম্পর্কে কতটা পরিচিত এবং নিজ উদ্যোগে সম্পৃক্ত? নারী মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বহুবিধ কর্মসূচির বিষয়ে দেশের তৃণমূল পর্যন্ত আপামর নারী জনসমাজের সচেতনতা এবং নারী স্বার্থ রক্ষা ও নারীর আত্মবিকাশে এ সকল সহায়ক সরকারি সেবা নিজ উদ্যোগে গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রয়োগে অধিকতর নিশ্চিত হতে পারে। **প্রতিবেদন : সুফিয়া বেগম**

## স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

# বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সনদ পেল বাংলাদেশ

মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার প্রতিরোধে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশকে বিশেষ সম্মাননা সনদ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. মার্গারেট চ্যানের হাত থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

*৬ সেপেটম্বর ২০১৬ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. মার্গারেট চ্যান-এর হাত থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সনদ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক*

*স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ১৩ অক্টোবর ২০১৬ মহাখালীতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নতুন ভবন উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি*

### ভেজাল ঔষধে কোনো ছাড় নয়: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, ভেজাল ঔষধের ব্যাপারে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না। সরকার ভেজাল ঔষধ তৈরির ৬৮টি কোম্পানি বন্ধ করেছে। এর মধ্যে ২৩টি স্থায়ী এবং বাকিগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজনে ভেজাল ঔষধের যত কোম্পানি আছে সব বন্ধ করা হবে। এ ধরনের কোম্পানিকে যেন ঔষধ শিল্প সমিতির সদস্য না করা হয়, সে নির্দেশও দেন তিনি।

১৩ অক্টোবর ২০১৬ রাজধানীর মহাখালীতে নবনির্মিত ঔষধ ভবনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভেজাল ঔষধের ব্যাপারে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।

### বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত

আলোচনাসভা, সচেতনতামূলক র‍্যালি, ব্যানার, ফেস্টুনসহ নানা আয়োজনে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে পালিত হয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিবছর ১০ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য, 'মানসিক স্বাস্থ্যে মর্যাদাবোধ- সবার জন্য প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা।'

'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ২০১৬ সালের তথ্যচিত্রে দেখা যায়, দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ১৬ দশমিক শূন্য এক ভাগ লোক মানসিক রোগে আক্রান্ত। অন্যদিকে ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু-কিশোরদের মধ্যে ১৮ দশমিক ৪ শতাংশই মানসিক রোগে আক্রান্ত। **প্রতিবেদন: আমজাদ হোসেন**

## সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

# মৌলবাদের বিরুদ্ধে নাট্যোৎসব

জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদী শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অংশ হিসেবে নিয়মিত নাট্যচর্চার মধ্যদিয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রত্যয় করেছেন নাট্যকর্মীরা। তারা শৈল্পিক উচ্চারণে জঙ্গিবাদ রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ আয়োজনে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়

জাতীয় নাট্যোৎসব। 'এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের, এ মাটি মানবতার' শিরোনামে শুরু হওয়া এ নাট্যোৎসব চলে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করে এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি সচিব আক্তারী মমতাজ, রামেন্দু মজুমদার ও নাট্যজন আতাউর রহমান।

### বীরকন্যা প্রীতিলতাকে স্মরণ

নাচ-গান-কবিতা আর স্মৃতিচারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনা বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে স্মরণ করল বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। বীরকন্যার আত্মাহুতি দিবস উপলক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রথমে 'যখন তোমার ভাঙবে ঘুম তখন তোমার সকাল'–গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন উদীচীর নৃত্যশিল্পীরা। সংগঠনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক এএন রাশেদার সভাপতিত্বে শুরু হয় আলোচনা। পরে উদীচী সংগঠনের অনেকেই অংশ নেন এ আলোচনায়।

### রবীন্দ্র-নজরুলের কবিতা আবৃত্তি

আবৃত্তি সংগঠন 'আবৃত্তি মেলার' ৩১ আগস্ট শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের স্মরণে 'রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা'। শুরুতেই ছিল সমবেত কণ্ঠে কবিগুরুর 'অন্তর মম বিকশিত করো' আবৃত্তি করেন আবৃত্তি মেলার শিল্পীরা। এরপর ছিল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতার একক আবৃত্তি।

### সব্যসাচী শিল্পীর জন্মদিনের উৎসব

শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের ৮২ তম জন্মদিন ছিল ১ সেপ্টেম্বর। এ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে আয়োজন করা হয় শিল্পীর জন্মদিনের উৎসবের। সেখানে তাঁকে শুভেচ্ছা জানায় চারুকলা অনুষদ ও এক ঝাঁক শিল্পী। শিল্পীরা তাঁকে 'সব্যসাচী শিল্পী' আখ্যায়িত করেন। জন্মোৎসবে তাঁকে নিয়ে কথা বলেন বিশিষ্টজনেরা। শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসায় সিক্ত মুস্তাফা মনোয়ার বলেন, 'শিল্পী বিচরণ করেন আনন্দালোকে, পথ চলেন মঙ্গলালোকে। সমাজে যা ঘটে তাই তুলে ধরাই সমাজের প্রতি শিল্পীদের দায়বদ্ধতা।'

### প্রণয় যমুনা

ঢাকার মঞ্চে যুক্ত হলো আরেকটি নতুন নাটক। ২ সেপ্টেম্বর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় প্রথমবারের মতো মঞ্চায়িত হয় 'প্রণয় যমুনা' নাটকটি। এটি লেখা হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রাধাকৃষ্ণ উপন্যাস অবলম্বনে। নাট্যরূপ দিয়েছেন আসাদুল ইসলাম। আর নির্দেশনা সুদীপ চক্রবর্তী। ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নাটকটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

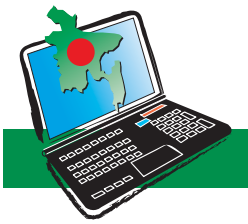

## ডিজিটাল বাংলাদেশ

# 'ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর আইসিটি' পেলেন সজীব ওয়াজেদ জয়

'ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর আইসিটি' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। ডিজিটাল বিশ্বের পথে বাংলাদেশকে পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন।

*১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য চারটি আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি*

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাতে নিউইয়র্কের হোটেল মিলেনিয়ামে উচ্চ পর্যায়ের একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গ্রহণের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক আইসিটির গুরুত্ব তুলে ধরতে সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন হলিউড অভিনেতা রবার্ট ডেভি।

ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস, প্ল্যান ট্রিফিনিও, গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাট প্রদেশের নিউ হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস সম্মিলিতভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশন উপলক্ষে এ বছর চালু করা হয়েছে পুরস্কারটি। প্রতিবছর এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের মন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা, জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক

সংগঠনের প্রধান, রাষ্ট্রদূত, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের নেতা ও খ্যাতিমান তারকারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এই পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশ থেকে কাউকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অর্জনের লক্ষ্যে রূপায়নকে সম্ভব করে তুলেছেন সজীব ওয়াজেদ। তিনি আরো বলেন, 'একজন মা হিসেবে প্রকৃতপক্ষে আমার ছেলে তাঁর কাজের জন্য স্বীকৃতি পাচ্ছে দেখে আমি গর্বিত'। পুরস্কার গ্রহণের পর সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'আমি এই পুরস্কার লাভ করায় খুব সম্মানিত বোধ করছি।'

**তথ্যপ্রযুক্তি খাতে চীনকে বিনিয়োগের আহ্বান**

চীনের ব্যাবসায়ীদের বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। চীনের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক বৈঠকে এ আহ্বান জানান ঢাকা চেম্বারের নেতারা।

রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বারের কার্যালয়ে ২২ সেপ্টেম্বর এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ের চেংগং নিউ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটির উপনির্বাহী পরিচালক লি রংহাউয়ের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের ওই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে এসেছে।

চীনের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে ডিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী বলেন, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশি তরুণ ও দক্ষ শিক্ষার্থীরা এ খাতে নিয়োজিত হচ্ছে। চীন ও বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা যৌথ উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তি বিনিয়োগ করতে পারেন। ডিসিসিআই পরিচালক এ কে ডি খায়ের মোহাম্মাদ খান, আসিফ এ চৌধুরী, মো. আলাউদ্দীন মালিক ও রিয়াদ হোসেন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

**দক্ষিণ এশিয়ায় মোবাইল সেবায় বাংলাদেশ তৃতীয়**

মোবাইল সেবা দেওয়ার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সংগঠন সাউথ এশিয়ান টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিলের (এসএটিআরসি) এক জরিপে বাংলাদেশের এই অবস্থান। এই জরিপ চালানো হয় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও ইরানের টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রাপ্ত তথ্য হতে।

১৭তম সাউথ এশিয়ান টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিলের (এসএটিআরসি-১৭) ঢাকায় শুরু হওয়া জরিপের ফল দ্বিতীয় দিনে প্রকাশ করা হয়। জরিপে ২৪টি মানদণ্ড ঠিক করা হয়।

রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী এই এসএটিআরসি সম্মেলনে ৯টি দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক রেগুলেটরি সংস্থার প্রধান, টেলিকম অপারেটর, উদ্যোক্তা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও টেলিকমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞসহ ১২২ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

**দেশে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৯ লাখ**

দেশে বর্তমানে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৩৯ লাখ ১৫ হাজার। জুলাই তে এর আগের মাসের তুলনায় ৬ লাখ ২৫ হাজার ইন্টারনেট গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসির ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে। জুন মাসে দেশে মোট ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল ৬ কোটি ৩২ লাখের বেশি এবং মে মাসে ইন্টারনেট গ্রাহকের মোট সংখ্যা ৬ কোটি ৩৩ লাখ। তবে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা বাড়লেও কমেছে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা। জুলাই মাস শেষে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা এর আগের মাসের তুলনায় ২৪ লাখ ৩৭ হাজার কমে ১২ কোটি ৮৯ লাখ ৩৯ হাজারে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে এই নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

**বাংলাদেশের তরুণরা 'রোমাঞ্চিত' ডিজিটাল সম্ভাবনায়**

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ভবিষ্যতে ডিজিটাল কাজের প্রসারের সম্ভাবনায় 'রোমাঞ্চিত'। তবে তারা ২০২০ সালের কর্মক্ষেত্রে মানবীয় দক্ষতায় অগ্রাধিকার পাবে বলে মনে করে। এছাড়া এ দেশের শতভাগ তরুণের ধারণা, ভবিষ্যতে অনেক পেশায় মানুষের জায়গা নিবে রোবট। বাংলাদেশসহ এশিয়ার ছয়টি দেশে অনলাইন জরিপটি পরিচালিত হয়। এ সহস্রাব্দের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবনা, প্রযুক্তির প্রভাব এবং ভবিষ্যতে চাকরির জন্য নিজেদের সর্বোত্তম উপায়ে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিষয়ে জরিপটি পরিচালিত হয়। জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, বাংলাদেশের তরুণরা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করছে। এছাড়া জরিপের ফলাফলে জানা গেছে, উত্তরদাতাদের শতভাগের ধারণা ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে রোবট একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, মিয়ানমার ও পাকিস্তানের ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সি চার হাজার দুইশত তরুণ 'জবস ফর ফিউচার' শীর্ষক এ অনলাইন জরিপে অংশ নেয়। **প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি**

## কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

# ব্রি উদ্ভাবন করল ধানের নতুন জাত

দেশের কৃষি এবং কৃষক সম্প্রদায়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে চলেছে ব্রি। এরই ধারাবাহিকতায় এবার ব্রি আবিষ্কার করেছে 'ব্রি হাইব্রিড ধান ৫'। বোরো মৌসুমের জন্য বিশেষ চাষ উপযোগী নতুন জাতের এই ধানটি। জাতটির কৌলিক সারি বিআর ১৫৮৫ এইচ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে (বিআরসি) অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৪তম সভায় কারিগরি কমিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বোরো মৌসুমে হাইব্রিড জাত ব্রি হাইব্রিড ধান ৫-কে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। গত দুই বছরের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির মূল্যায়নের

ভিত্তিতে সারা বাংলাদেশে জাতটির চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করে কারিগরি কমিটি। দেশীয় ভাবে উদ্ভাবিত পিতৃ ও মাতৃ সারি ব্যবহার করে উদ্ভাবিত তৃতীয় জাত এটি। পিতৃ-মাতৃ সারি দেশীয় ভাবে উদ্ভাবিত বিধায় জাতটির রোগ-প্রতিরোধ ও বৈরী পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বেশি।

ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ অধিক গুণাবলি সম্পন্ন। এ জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেন্টিমিটার, কাণ্ড শক্ত বিধায় হেলে পড়ে না, স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ প্রতি কুশির সংখ্যা ১২-১৫টি, ফলন ৮.৫-৯টন/হেক্টর, জীবনকাল ১৪৩-১৪৫ দিন, গাছের গোড়া খয়েরি বর্ণের এবং দানায় কাঁচা অবস্থায় লাল বর্ণের টিপ (apiculus) বিদ্যমান, দানার আকৃতি সরু ও লম্বা, দানায় শর্করার পরিমাণ ২৩.৪ ও প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৯ ভাগ, ভাত ঝরঝরে, আমন ও বোরো উভয় মৌসুমে বাণিজ্যিকভাবে বীজ উৎপাদন লাভজনক। আমন মৌসুমে পিতৃ ও মাতৃ সারির জীবনকালের পার্থক্য ৮ দিন ও বোরো মৌসুমে ১৪ দিন। উভয় মৌসুমে এই জাতটির বীজ উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক।

ভিয়েতনামের বারোমাসি আম চাষে সফলতা মাগুরার হার্টিকালচার সেন্টারের বাগানে প্রথমবারের মতো বারোমাসি আম চাষে সফলতা এসেছে। বারো মাসই ফল ধরবে এমন একটি বিশেষ জাতের আমের ফলন হয়েছে এই বাগানে। ভিয়েতনাম থেকে এই জাতের আমের চারা এনেছে কৃষি বিভাগ। পরীক্ষামূলকভাবে মাগুরা হার্টিকালচার সেন্টারের বাগানে দুবছর আগে এই চারা লাগানো হয়।

মাগুরা হার্টিকালচার সেন্টারের উদ্যানতত্ত্ববিদরা জানান, ভিয়েতনামের এই জাতের আমের নাম চুঁ। ৩ বছর আগে ভিয়েতনামে প্রশিক্ষণে গিয়ে সেখানকার জার্ম প্লাজম কালেকশন সেন্টার থেকে মাগুরা হার্টিকালচারের কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এই আমের ৩টি চারা নিয়ে আসেন। ওই বছরই এগুলো লাগিয়েছিলেন মাগুরা হার্টিকালচার সেন্টারের মাঠে। গত বছর চৈত্র-বৈশাখে প্রথম ফলন আসে এই গাছে। পরবর্তীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩ বার মুকুল ও ফলন এসেছে সেখানে। গাছটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গাছের কিছু ডালে আম পরিপক্ক হতে না হতেই আরেকটি ডালে মুকুল এসে যায়। এভাবে ৪ মাস অন্তর এটিতে ফলন আসে। এ কারণেই এটিকে বারোমাসি আম বলা হয়। পরিপক্ক আমগুলোর প্রতিটির ওজন ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম। গাঢ় হলুদ রঙের আমগুলো খেতে অনেক সুমিষ্ট। গাছগুলোর উচ্চতা হয় ৭ থেকে ৮ ফিট। এই আমগুলো প্রাকৃতিকভাবে দ্বিগুণ সংরক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ জাতের পাবন আম গাছ থেকে তোলার পর বাড়িতে এক সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়, সেখানে এই জাতের আম ১৫ দিন সংরক্ষিত থাকে।

**প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

# আদিবাসী দিবসে রাঙামাটিতে আলোচনা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আদিবাসীদের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার–এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক 'আদিবাসী দিবস-২০১৬'।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)- এর সহায়তায় ১০ আগস্ট আদিবাসী উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে দিবসটির দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার।

পরে রাঙামাটি পৌরসভা কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় দিবসের আলোচনা সভা। চাকমা সার্কেল চিফ ব্যারিস্টার দেবাশিষ রায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী ফোরামের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রাঙামাটি সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অরুণ কান্তি চাকমা, এম এন লারমা ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, আইনজীবী সুস্মিতা চাকমা।

পরে অনুষ্ঠান স্থলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে রাঙামাটি শহরে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি রাঙামাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

**ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমমর্যাদা শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল**

দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সকলের নাগরিক অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকে শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টারই ফসল বলে বর্ণনা করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ জুলাই ঢাকায় ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সৌহার্দ্যকে দেশের উন্নয়নের মহামন্ত্র বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা সংবিধানের স্বীকৃতি ও শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ন্যায্য অধিকার, নাগরিক

*তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৫ জুলাই ২০১৬ ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি*

ক্ষমতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছেন।

দেশের সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমান অধিকারের অধিকারী। কেউ কাউকে ছোটো-বড়ো চোখে দেখার সুযোগ নেই'।

'পার্বত্য চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার নির্দেশনায় গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনের ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা দেশের উন্নয়নে বড়ো ভূমিকা রাখতে সক্ষম', বলেন ইনু।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিশন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর গুরুত্বারোপ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা হলে তা এ বিষয়ে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুসারে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং তার মন্ত্রণালয়ের কাজে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জুয়েল চাকমার একটি আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক অর্জন করে।

**প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা**

## যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

### কদমতলী ফ্লাইওভার

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের 'কদমতলী ফ্লাইওভার'– এর নির্মাণ কাজ শেষ। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (চউক) ৫৮ কোটি টাকায় তৈরি উড়াল সড়কটি চালু হলে ব্যস্ততম নিউমার্কেট থেকে আগ্রাবাদ পর্যন্ত সড়কে যানজট কমে আসবে এবং চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন এলাকাটি পরিচ্ছন্ন থাকবে বলে মনে করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাবৃন্দ। তাছাড়া, ব্যস্ততম এই এলাকায় তিনটি বাস টার্মিনাল রয়েছে। আন্তঃজেলা টার্মিনাল, বিআরটিসি এবং চট্টগ্রাম-শুভপুর বাস টার্মিনাল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালি- কুমিল্লা ও রাঙামাটিসহ বিভিন্ন গন্তব্যে প্রতিদিন শত শত বাস ছেড়ে যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের অবস্থানও কাছাকাছি। দীর্ঘদিন এই ওভারব্রিজটির নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়ায় ট্রেনযাত্রীদের অনেক ভোগান্তি হয়েছে। ২০১২ সালে শুরু হওয়া ১ দশমিক ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই উড়াল সড়কটি জুন ২০১৫ তে শেষ হওয়ার কথা ছিল। চউক চেয়ারম্যান আবদুছ ছালাম বলেন, কদমতলী ফ্লাইওভারের কাজ শেষ। চট্টগ্রামবাসীর ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত দিয়েই এটি উদ্‌বোধন হবে। সাধারণ জনগণের ধারণা কদমতলী ফ্লাইওভার যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব করবে এবং চট্টগ্রাম রেলস্টেশন এলাকাটি অনেক পরিছন্ন থাকবে। এই ফ্লাইওভারটি চট্টগ্রামকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেবে। সাধারণ মানুষেরা সেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক চট্টগ্রাম দেখার অপেক্ষায় আছে। **প্রতিবেদন : শিবপদ ম-ল**

## ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

### অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলা

রাঙামাটির প্রকৃতি, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি ভ্রমণপ্রিয়দের আকৃষ্ট করে। প্রকৃতি যেন এখানে বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়। এখানে চলে পাহাড়, নদী আর হৃদয়ের মিলনমেলা। লেকের জলে ভেসে ওঠা ছোট্ট শহর, নানান বৈচিত্র্যের ভাণ্ডারের মধ্যে উপজাতীয় সংস্কৃতি, পাহাড়ি জনপদ এবং মানুষের জীবন সংগ্রাম এসবই রাঙামাটির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। শহরের আকর্ষণ উপজাতীয় জাদুঘর। এখানকার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুরোটাই মিলবে জাদুঘরে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যেন ঘুমিয়ে আছে শান্ত জলের হ্রদ যা কাপ্তাই লেক নামে সর্বজন বিদিত। পাকিস্তান আমলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে কর্ণফুলি নদীর গতিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পাহাড়ের ফাঁকফোকরের সমতল আবাদি জমিগুলো পানিতে পূর্ণ হয়ে বিশাল এক সরোবরে পরিণত হয়। এটাই এখন কাপ্তাই লেক। সম্পূর্ণ লেকটিকে আবৃত করে রেখেছে পর্বতশ্রেণি। লেকের নীল জল যে কারো হৃদয়কে শীতল করে দিতে পারে।

জেলার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জায়গার মধ্যে শুভলং ঝরনা একটি। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসে ঝরনাটি পতিত হয়েছে কাপ্তাই লেকে। পাশেই শুভলং বাজার। বাজারের রেস্টুরেন্ট ও হোটেলগুলো পাহাড়ি খাবারে ভরপুর। বিন্নিচাল, তিতগুলা, তিতবেগুন, বাঁশপ্রোল, গোমাইত্যা, শিমে আলু, তারা ডাটা এগুলো স্থানীয়

পাহাড়ি খাবার সহজেই পাওয়া যায় । কাপড়ের দোকানে পাওয়া যায় তাদের বোনা ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের পোশাক, গামছা, গায়ের চাদর, কম্বল ইত্যাদি।

জেলার রাজবন বৌদ্ধ বিহার পর্যটকদের কাছে একটি আকর্ষণীয় জায়গা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি পবিত্র স্থান। আধ্যাত্মিক মন্দির বলেও এর পরিচিতি বা নাম রয়েছে।

আছে কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক–যা ১৯৯৯ সালে ৫,৪৬৪.৭৮ হেক্টর জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্ণফুলী নদী এবং কাপ্তাই মাউন্টেন রেঞ্জের মাঝামাঝি পর্যায়ে এ জাতীয় উদ্যানের অবস্থান। এখানে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে রয়েছে–হরিণ, বন বিড়াল, হাতি, বানরসহ অন্যান্য প্রাণী। বিলুপ্ত প্রায় বেশ কয়েকটি পাখিও রয়েছে। বর্তমানে এটি একটি বন্য পশুপাখির এক অভয়ারণ্য।

কাপ্তাই লেকেরই বিশেষ এক অংশে স্থাপিত রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু। দৃষ্টিনন্দন এই সেতুকে কেন্দ্র করে এখানে রয়েছে একাধিক ক্যাটাগরির বোটিং সেবার আয়োজন। বর্ষায় লেক ও তার চারপাশের প্রকৃতিতে লাগে যৌবনের ছোঁয়া। পানিতে টইটম্বুর হয়ে যায় লেক প্রাঙ্গণ। কাপ্তাই লেকের একটি অংশের মাঝখানে দ্বীপের মতো জায়গাটিতে একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে– যা 'প্যাদা টিং টিং' নামে পরিচিত। মণ্ডি, নুডুল মণ্ডি, চিকেন চাটনি ইত্যাদি পাহাড়ি খাবার এখানে পাওয়া যায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে সবাই রাঙামাটিতে ভিড় জমায়। লাল পাহাড়ের দেশে পাহাড় আর প্রকৃতি পর্যটকদের মনে এনে দেয় অনাবিল আনন্দ। **প্রতিবেদন : অনিন্দিতা**

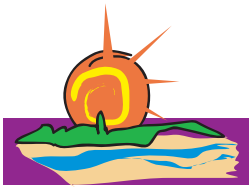

## পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

# পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার– ভূমিমন্ত্রী

মানুষ যদি প্রকৃতি বিরুদ্ধ আচরণ করে তখন পরিবেশের নিজস্ব ধর্ম বা চেহারা হারিয়ে যায়, যা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্ব নিয়ে কাজ করছে। সপ্তম ন্যাশনাল ন্যাচার সামিট অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ একথা বলেন। তিনি বলেন, নদী এতটাই দূষণের কবলে পড়েছে যে, বর্ষাকালেও ঢাকার চারদিকের বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালু নদীতে কেউ নামতে পারে না। এসব নদীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়টি সরাসরি মনিটরিং করছেন। ভূমিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের প্রাকৃতিক বনকে প্রায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে কক্সবাজার, হাতিয়া পার্বত্য অঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে বনায়ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। এক্ষেত্রে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নটর ডেম কলেজ মিলনায়তনে সপ্তম ন্যাশনাল ন্যাচার সামিট অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন– বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, ডেপুটি প্রধান বন রক্ষক ড. তপন দে, বন রক্ষক অসিত রঞ্জন পাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নিয়াজ আহমেদ খান প্রমুখ।

### কমনওয়েলথের নতুন জলবায়ু তহবিল

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার জন্য নতুন একটি তহবিল চালু করেছে কমনওয়েলথ। কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড এই তহবিলের উদ্‌বোধন করেন। 'দ্য কমনওয়েলথ ক্লাইমেট ফিনান্স অ্যাকসেস হাব' নামের এই তহবিলে ২০২০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন জলবায়ু তহবিল নিয়ে কমনওয়েলথ মহাসচিব স্কটল্যান্ড বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্যারিস চুক্তি কার্যকরের পথে এটা 'বাস্তবে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া'।

### জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের অনুসমর্থন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে অনুসমর্থন দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশসহ অন্তত ৩০ দেশ। জাতিসংঘ জানিয়েছে, অন্তত ৩০টি দেশ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ওই চুক্তিতে তাদের অনুসমর্থন পেশ করবে। বিশ্বের ১৮০টি দেশের সমর্থনে করা প্যারিস জলবায়ু চুক্তির মূল লক্ষ্য বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থসহায়তা দেওয়া। গত বছরের ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক এই চুক্তিতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির গড় হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বা সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে বিশ্বের দেশগুলো একমত হয়।

### বিশ্ব বসতি দিবস

৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হলো বিশ্ব বসতি দিবস। সরকারি-বেসরকারি নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে দিনটি। এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল : 'Housing at the Centre'। **প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

## চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

# ঈদে এবার তিন ছবি

ঈদ মানেই আনন্দ। আর এই আনন্দকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে ঈদে নতুন ছবি দেখা। এবার ঈদে মুক্তি পেয়েছে তিনটি ছবি। এগুলো হলো– জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত সুমন ওয়াজেদ পরিচালিত *রক্ত*। কলকাতার সঙ্গে যৌথ আয়োজনে নির্মিত *রক্ত* ছবিটিতে অভিনয় করেছেন পরীমণি। এতে অ্যাকশন গার্ল হিসেবে নতুন রূপে বড়ো পর্দায় হাজির হয়েছেন এই নায়িকা। গল্প, গান, নির্মাণ আর অভিনয়ের কারণে ইতোমধ্যে আলোচনায় এসেছে ছবিটি।

দ্বিতীয়টি *শুটার* ছবিতে অভিনয় করেছেন– শাকিব খান ও বুবলী। এটিও অ্যাকশন। রোমান্টিক গল্পের ছবি। আরো আছেন অ্যান্টি ক্যারেক্টার সম্রাট। ঈদে সবচেয়ে বেশি সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে এ ছবিটি। অ্যাকশন– রোমান্টিক গল্পে নির্মিত হয়েছে *শুটার*।

অন্যটি *বসগিরি*। এ ছবিতেও অভিনয় করেছেন– শাকিব খান ও বুবলী। এটিও অ্যাকশন- রোমান্টিক গল্পের ছবি।

### ১৭তম এশিয়াটিক ফিল্ম মিডিয়ালে বাংলাদেশের তিন ছবি

১৭তম এশিয়াটিক ফিল্ম মিডিয়ালে প্রতিযোগিতা করেছে বাংলাদেশি নির্মাতা ফারজানা ববির প্রামাণ্যচিত্র 'বিষকাঁটা'। ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের আরো দুটি চলচ্চিত্র। রুবাইয়াত হোসেনের আন্ডার কন্সট্রাকশন ও বাংলাদেশের প্রথম আদিবাসী ভাষায় নির্মিত অং রাখাইনের 'মাই বাইসাইকেল' ছবি দুটি প্রদর্শিত হয়েছে এ উৎসবের প্যানোরোমা বিভাগে। আর এ তিনটি ছবির পরিবেশনার দায়িত্বে ছিল খনা টকিজ। এ উৎসব শুরু হয় ১৭ সেপ্টেম্বর। যা চলে ২ অক্টোবর পর্যন্ত। এ আসরে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, চীন, ফিলিপাইনসহ ২০টি দেশের ৪০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

### ভারতে রপ্তানির অনুমতি পেয়েছে 'সম্রাট' ও 'অনিল বাগচীর একদিন'

বিনিময় নীতিমালার অধীনে ভারতে রপ্তানির অনুমতি পেয়েছে 'সম্রাট' ও 'অনিল বাগচীর একদিন' ছবি দুটি। শাকিব খান অভিনীত 'সম্রাট' ছবিটি রপ্তানি করেছে খান ব্রাদার্স এবং বেঙ্গলের ছবিটি 'অনিল বাগচীর একদিন'।

### কসোভোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার

সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন তৌকির আহমেদ। 'দ্য গডেস অন দ্য থ্রোন' শীর্ষক কসোভোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'অজ্ঞাতনামা' ছবিটির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতলেন তৌকীর আহমেদ। সেরা চিত্রনাট্যকারের পুরস্কারটিও এসেছে তার হাতে। এ উৎসবটি ৩১ আগস্ট শুরু হয়ে শেষ হয় ৪ সেপ্টেম্বর।

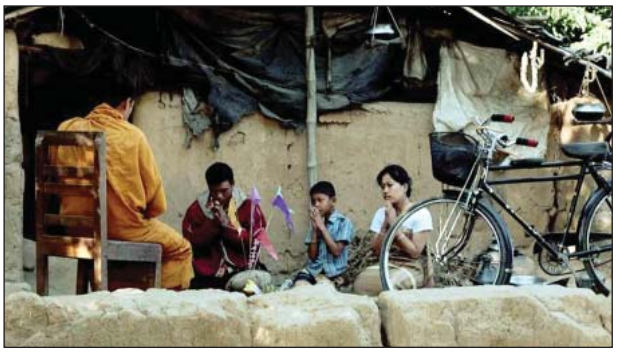

*মাই বাইসাইকেল*

**প্রতিবেদন : মিতা খান**

## আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

# ডেল্টা কোয়ালিশনের সভাপতি বাংলাদেশ

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ মাহমুদ আলীর কাছে নেদারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক পানি বিষয়ক বিশেষ দূত হেঙ্ক অভিঙ্ক তার ডেল্টা কোয়ালিশনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ২১ সেপ্টেম্বর

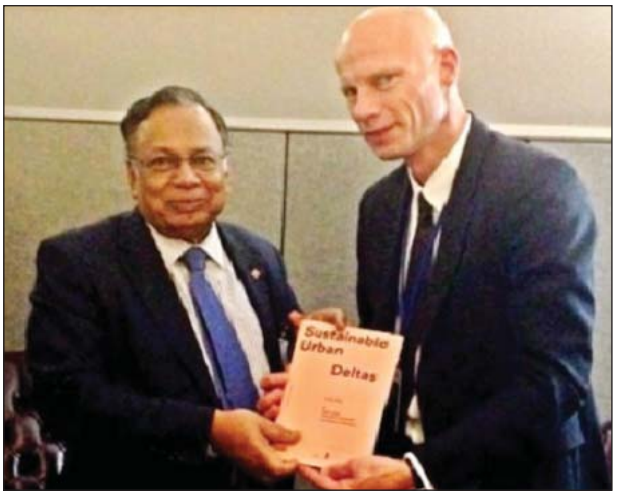


এ দায়িত্ব হাতবদল হয় বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়।

বাংলাদেশ পরবর্তী এক বছর ডেল্টা কোয়ালিশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবে। এ সময়ে মরক্কোর মারাকেশে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ-২২(৭-১৮ নভেম্বর ২০১৬) চলাকালীন একটি কার্যকরী সভার আয়োজন এবং ২০১৭ সালের দ্বিতীয় ভাগে ঢাকায় মন্ত্রী পর্যায়ের একটি সম্মেলনের আয়োজন করবে। ডেল্টা কোয়ালিশন পৃথিবীর প্রথম সরকারি পর্যায়ের আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন– যা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনকে মাথায় রেখে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ডেল্টা ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সহনীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির সক্ষমতা অর্জনে নিয়োজিত। এই কোয়ালিশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো– বাংলাদেশ, কলম্বিয়া, মিসর, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মোজাম্বিক, মিয়ানমার, নেদারল্যান্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনাম।

### ব্যক্তিগত ও মাথাপিছু সম্পদে শীর্ষ ১০ দেশ

বিশ্বসেরা ধনীদের তালিকায় যেমন রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আধিক্য তেমনি জনগণের ব্যক্তিগত সম্পদের সমষ্টিগত হিসাবেও শীর্ষস্থানটি তাদের দখলে। তবে মাথাপিছু সম্পদের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে মোনাকো। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ নামের একটি বৈশ্বিক আর্থিক অনুসন্ধান ও বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি 'দ্য টেন ওয়েলদিয়েস্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' বা 'ডব্লিউ টেন' নামের এই তালিকা প্রকাশ

করেছে। ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের জনগণের ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাব করে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে। তালিকাটি নিম্নরূপ :

| বিশ্বে মোট ব্যক্তিগত সম্পদে শীর্ষ ১০ | | | বিশ্বে মাথাপিছু সম্পদে শীর্ষ ১০ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অবস্থান | দেশ | সম্পদ | অবস্থান | দেশ | সম্পদ |
| ১. | যুক্তরাষ্ট্র | ৪৮,৯০০ | ১. | মোনাকো | ১৫,৫৬,০০০ |
| ২. | চীন | ১৭,৪০০ | ২. | লাইচেনস্টেইন | ৬,১০,০০০ |
| ৩. | জাপান | ১৫,১০০ | ৩. | সুইজারল্যান্ড | ২,৮৪,০০০ |
| ৪. | যুক্তরাজ্য | ৯,২০০ | ৪. | অস্ট্রেলিয়া | ২,০৩,০০০ |
| ৫. | জার্মানি | ৯,১০০ | ৫. | নরওয়ে | ১,৯৩,০০০ |
| ৬. | ফ্রান্স | ৬,৬০০ | ৬. | লুক্সেমবার্গ | ১,৭৯,০০০ |
| ৭. | ভারত | ৫,৬০০ | ৭. | সিঙ্গাপুর | ১,৫৭,০০০ |
| ৮. | কানাডা | ৪,৭০০ | ৮. | যুক্তরাষ্ট্র | ১,৫১,০০০ |
| ৯. | অস্ট্রেলিয়া | ৪,৫০০ | ৯. | যুক্তরাজ্য | ১,৪৭,০০০ |
| ১০. | ইতালি | ৪,৪০০ | ১০. | সুইডেন | ১,৪৩,০০০ |
| (শতকোটি মার্কিন ডলারে) | | | (মার্কিন ডলারে) | | |

**প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন**

## ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

# টেস্ট ক্রিকেটে থাকতে পারে নতুন চমক

সম্প্রতি আফগানিস্তানের সাথে ২-১ সিরিজ জিতলেও ইংল্যান্ডের সাথে ২-১ সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ। একদিনের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে টানা সপ্তম সিরিজে জয় না হলেও ইংল্যান্ড দল বুঝতে পেরেছে এক দিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশের শক্তির কী ঝাঁঝ। তবে আমরা মনে করি ক্রিকেটের আসল সৌন্দর্যই টেস্ট ক্রিকেট। আর এই টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ একদিন চমক দেখাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

### তামিমের পাঁচ হাজার রান

দেশের হয়ে ওয়ানডের পাঁচ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করল তামিম ইকবাল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চট্টগ্রামের এম. এ. আজিজ স্টেডিয়ামে তৃতীয় ওয়ানডেতে তামিম শুরু করেন ৪৯৬২ রান নিয়ে। লাল-সবুজের ক্রিকেট সৈনিক হিসেবে নতুন ক্লাবের সদস্য হতে প্রয়োজন ছিল ৩৮ রান। ইতিহাসে মাত্র ৭৮ জন ক্রিকেটারের রয়েছে এই রেকর্ড। ১ম বাংলাদেশি হিসেবে তামিমের এই অর্জনটি ১৫৯ ম্যাচের ১৫৮ তম ইনিংসে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।

### সেরা দশে মাশরাফি

অধিনায়কত্বই মাশরাফির দলে টিকে থাকার অস্ত্র নয়। আইসিসির সব শেষ র‍্যাংকিংয়েও তারই স্বীকৃতি। ওয়ানডের সেরা নবম বোলার বাংলাদেশে অধিনায়ক। এই প্রথম শীর্ষ দশে আর এক বাংলাদেশির নাম যুক্ত হলো। এর আগে আছেন বাংলাদেশের

সাকিব আল হাসানের নাম। তবে ওয়ানডে র‍্যাংকিং-এ সেরা অলরাউন্ডার এখনো শীর্ষে আছেন সাকিব আল হাসান। তামিম ইকবাল আছেন ২২তম স্থানে।

### ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডবলে রানার আপ বাংলাদেশ

ঘরের মাঠে পুরুষ ও নারী দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। বাংলাদেশের কোনো দলই ফাইনালে সেভাবে লড়াই করে উঠতে পারেনি। ছেলেরা ২৫-৪৬ গোলে হারে এবং নারীরা ২৯-৪৮ গোলের ব্যবধানে হেরে রানার আপ হয়।

### ৪ হাজারি ক্লাবে মুশফিক

তৃতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডেতে ব্যক্তিগত চার হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করল বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৪০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছান তিনি। এই ক্লাবে নাম লেখাতে তার প্রয়োজন ছিল মাত্র ১২ রানের। ইনিংসের ১৭ তম ওভারে আদিল রশিদের বলে সিঙ্গেল নিয়ে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের এমন রেকর্ড গড়েন বাংলাদেশের এই ডানহাতি উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান। এর আগে ৪০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন সাকিব আল হাসান। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ২০১৫ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে এ সম্মানের অধিকারী হন তিনি। চার হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছাতে সাকিবের লেগেছে ১৪২ ম্যাচে ১৩৬ ইনিংস।

**প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**

# নবারুণ

## নিয়মিত পড়বে
## লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।


সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০


ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন


সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

# সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 4 October 2016, Tk. 25.00

*মন কাড়া শরৎ-এর শিউলি*

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা